আলোকিত অতীত

একটি স্মারক সংকলন

আলোকিত অতীত

প্রকাশনায় ঃ
গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান মৃত্যুবার্ষিকী পালন কমিটি

www.pathagar.com

আলোকিত অতীত

প্রকাশক ঃ এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান খান
বাড়ী নং-১২০, রোড নং-২৭, ব্লক-এ
বনানী মডেল টাউন-ঢাকা

সম্পাদনায় ঃ গোলাম মোস্তফা ভূইয়া

প্রকাশ ঃ ২৫ আশ্বিন, ১৪১৪ বাংলা, ২৭ রমযান, ১৪২৮ হিজরী
১০ অক্টোবর, ২০০৭ ইশায়ী

মুদ্রণ ঃ বর্ণরেখা প্রিন্টিং প্রেস
১৪৩/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা।

www.pathagar.com

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান

জন্ম : ২৮ জুলাই ১৮৯৯ শাহাদাত : ১৩ অক্টোবর ১৯৭১ সাল

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

জীবনে প্রাপ্তি ও পূর্নতার মধ্যে দ্বন্ধ চির দিনের হলেও, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তা একই রূপে আবির্ভূত হয় না। কারও কারও জীবন প্রাপ্তি ও পূর্নতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে টিকে থাকবে- মানুষ সে জীবনকে ভালবাসে এবং স্বরণের জগতে লালন করে। এমনই একজন মানুষ গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান।

আবদুল মোনয়েম খান এর মৃত্যুর পর দীর্ঘ প্রায় ৩৬ বছর সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে, জীবনকে তিনি রেখে গেছেন তার অসংখ্য কৃত্বির কাছে, সে জীবনের মৃত্যু নেই। এ জীবন বেঁচে থাকে কালের যাত্রা পথে, মানুষের জীবনে আলোক বর্তিকা হিসেবে।

জীবনের যে পরিচয় গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান রেখে গেছেন তার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। নশ্বর মানুষের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন- যা কখনও ঈর্ষার কখনও বিতর্কের।

আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন মানুষ, ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে নন। কিন্তু, তাঁর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব আজও বিভ্রান্তির বেড়াজালে। লেখকগন তাদের একান্ত উপলব্ধি দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু, তা অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ। বিপর্যস্থ জাতি ও ইতিহাস বিস্তৃত নতুন বংশধরদের কাছে এই ছোট্ট স্মরনিকাটি মোটেও যথেষ্ট নয়। তিনি ছিলেন ইসলামী ধ্যান-ধারনা সমৃদ্ধ। ইসলামী চেতনা, ইসলামী উপলব্ধি তাঁকে ঘিরে রেখেছিল আমৃত্যু। এমনকি ব্যবহারিক জীবনেও তিনি ইসলামী। দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকলেও ইসলামের স্বপক্ষেই ছিল তার আজীবন সংগ্রাম।

রাজনৈতিক বিশ্বাসে আমি নিজে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খানের অনুসারী নই। তবুও রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকেই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সৃষ্টি। অবশ্যই এ জন্য আমাকে সাহায্য করেছেন আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু, সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মহাসচিব আতিকুল ইসলাম। তবে মরহুমের পুত্র এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান খানের কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে।

স্বল্প পরিসরে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান এর জীবন চিত্র তুলে ধরা এক কষ্টকর কাজ। যে মানুষের জীবন বিস্তৃত ও উজ্জ্বল আলোক শিখার সম্মিলন তাঁর 'আলোকিত অতীত' সংকলন করা দুরুহ।

সংকলনটির ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত নিবেদন রইল।

-গোলাম মোস্তফা ভূইয়া

www.pathagar.com

প্রকাশকের নিবেদন

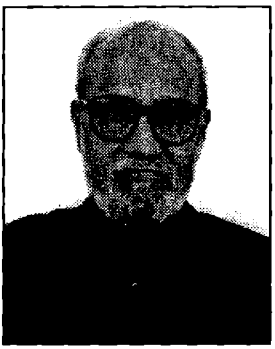

এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের স্থপতি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই একটি প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ৭ বছর ৪ মাসের শাসনামলে তিনি এ অঞ্চলকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু, আশ্চার্য্যের বিষয় হচ্ছে, দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার নতুন প্রজন্ম যুব সমাজ গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্পর্কে একরূপ অজ্ঞতার মাঝে রয়েছে। তারা গভর্ণরের কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বাভাবিক কারনেই অবগত হতে পারেনি। তবে এ ব্যার্থতা তাদের একার নয়। এ ব্যাপারে আমরাও চরম ব্যার্থ তার পরিচয় দিয়েছি। গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্পর্কে তেমন কোন প্রকাশনা নেই। বরং উল্টোটাই জানানোর পাল্লাই আজ ভারী হচ্ছে। এতাবস্থায় দেশবাসীকে সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্ববোধ থেকেই বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মহাসচিব আতিকুল ইসলাম ও তরুন রাজনীতিক কলামিষ্ট গোলাম মোস্তফা ভুইয়া 'আলোকিত অতীত' নামক স্বরণিকাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রন্থ করে আমাকে বিষয়টি অবহিত করে সহযোগিতা কামনা করেন। গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, আমলা, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবি, বিচারপতি, আইনজীবিদের অনেক লেখা যা আমার নিকট সংরক্ষিত ছিল তা থেকে কিছু লেখা ও ছবি সংগ্রহ করে 'আলোকিত অতীত' নামে স্বরনিকাটি প্রকাশ করেছে। আমি তাদের উভয়কে অভিনন্দন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্বরনিকাটি গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্পর্কে জানানোর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। 'গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান অর্থনৈতিক বুনিয়াদের স্থপতি' নামে তিন খন্ডের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল লেখা ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে তিন খন্ডে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করবো ইনশাল্লাহ্।

বিলম্বে হলেও 'আলোকিত অতীত' নামক স্বরনীকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের সঠিক ইতিহাসের নির্দেশনা দিবে, এটাই প্রত্যাশা।

স্বরনীকাটি প্রকাশের ব্যাপারে জনাব আতিকুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফা ভূইয়ার সার্বিক সহযোগীতার জন্য আবারো আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান খান
১০ অক্টোবর, ২০০৭ ইংরেজী

www.pathagar.com

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান
সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ঃ ১৮৯৯ সালের ২৮শে জুলাই।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম- হুমায়ুনপুর, থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ, (বৃহত্তর ময়মনসিংহ)।

পরিচয় ঃ পিতা- জনাব কমর আলী খান। মাতা- মোসাম্মৎ নসিবা খাতুন।

শিক্ষাজীবন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা-বাজিতপুর। ১৯১৬ সাল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ঐচ্ছিক অঙ্কে লেটারসহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯২০ সালে ঐ কলেজ থেকে ২য় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম বার এবং ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২য় বার আইন ডিগ্রী লাভ করেন।

সমাজ সেবা ঃ ছোটবেলা থেকেই নানান জনসেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা কবলিত এলাকায় সুভাস চন্দ বসুর সঙ্গে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৩২ সালে ময়মনসিংহ জেলা আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই পদে থেকে তিনি সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি বেঙ্গল আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া কমিটিতে জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলার ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে বিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন'-এর সামনে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। ১৯৪৫ সালে ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডের সদস্য এবং ময়মনসিংহ পৌরসভার কমিশনার হিসাবে সামাজিক ও জনহিতকর কাজে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার জিলা স্কুল বোর্ড এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য হন। ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক প্রতিরক্ষা কমিটি এবং প্রাদেশিক সেনা, নৌ ও বিমান বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

খেলাধুলা ঃ স্কুল জীবন থেকেই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রথম এথলেটিক সেক্রেটারী নির্বাচিতন হন। ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদ হিসেবেই ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহ মোহামেডান স্পোটিং ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন ঃ ১৯২৫-২৬ সালে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে একটা হাইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯২৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা উকিলবারে যোগদান করেন এবং ওকালতী পেশায় নিয়োজিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে একজন সফল আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আইন পেশায় যুক্ত ছিলেন।

রাজনৈতিক জীবন ঃ ১৯৩৫ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করে ময়মনসিংহ জিলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁরই আমন্ত্রণে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম বারের মত ময়মনসিংহ সফর করেন এবং জিলার বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত ৩টি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলিম লীগের 'ন্যাশনাল গার্ড' গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুশৃঙ্খল এক লক্ষ 'ন্যাশনাল গার্ড' গঠন করে প্রথম 'সালরে জিলা' হন।। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ক্রান্তিলগ্নে তিনি পুনরায় জিলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এন.ই. ৫২ ময়মনসিংহ-৮ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের ২৮ শে অক্টোবর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৭ বছর ৫ মাস সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৯ সালের ২১ শে মার্চ গভর্ণর পদ থেকে ইস্তফা দেন।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৫২ সালে কানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিত 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন' সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য সফর করেন। ১৯৬৬ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে তিনি সপরিবারের ইস্তানবুল সফর শেষে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে তুরস্ক, ইরাক, মিশর ও যুক্তরাজ্য সফর করেন।

মৃত্যু ঃ ১৯৭১ সালের ১৩ই অক্টোবর মাগরিবের নামাজের পর তাঁর বনানীস্থ বাসভবনে আততায়ীর গুলীতে আহত হন এবং পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ৮টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

www.pathagar.com

রাজনৈতিকভাবে উনি খুব সৎ ছিলেন

মিজানুর রহমান চৌধুরী

[জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সংসদে আটবার সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা হিসাবে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় পার্টির শাসনামলে তিনি কিছুদিন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তিনি জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ।]

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্বন্ধে কি বলেন তা জানার জন্য আমরা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর বাসভবনে যাই। সেখানে তাঁর নিকট থেকে নেয়া একান্ত সাক্ষাতকারটি হুবহু এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, আমরা জানি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান এবং আপনি বিপরীত দুই মেরুর বাসিন্দা ছিলেন। তা সত্ত্বেও যেহেতু একইসময়ে রাজনীতি করেছেন, তাই গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের ভালমন্দ অনেক কিছুই আপনি জানেন। একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি তাঁর সম্বন্ধে কিছু বললে আমরা খুশী হতাম, আর বর্তমান প্রজন্মও তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারতো।

জনাব চৌধুরী ঃ উনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সেরকম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। তার কারণ বয়সের পার্থক্য। আর উনি থাকতেন ময়মনসিংহে, আমি ঢাকা ও চাঁদপুরে। কিন্তু উনি যখন এম.এন.এ. হয়ে গেলেন তখন উনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। আমরা রাওয়ালপিন্ডিতে একটা বাড়িতেই থাকতাম। অন্ততপক্ষে ৮ জন ছিলাম। ঐ ৮ জনের মধ্যে ফখরুদ্দিন সাহেবও ছিলেন। তারপর আমি, সৈয়দ আজিজুল হক এই আমরা কয়েকজন ছিলাম। তো আমাদের দেখাশোনা ও সেখানকার ম্যানেজমেন্ট ট্যানেজমেন্ট উনিই দেখাশুনা করতেন। তাই ব্যাক্তিগতভাবে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয় উনার সঙ্গে। একদিন পাকিস্তানের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী ফিদা হাসান রাত্রে উনার সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। আমরা তখন ভাবছি– আগামী দিন হয়তো কেবিনেট হবে। সেজন্য কেবিনেট সেক্রেটারী এসেছেন। আমরা এটা অনুমান করলাম। কিন্তু সকালে দেখলাম– উনি উনার অভ্যাস মতো শেরওয়ানী ও চোস্ত পাজামা পরে বের হয়ে

www.pathagar.com

এলেন। আমর রুমটা ছিল একেবারে দরজার কাছে। তখন তো রাওয়ালপিন্ডিতে বেশী বাড়িঘর ছিল না। কোন হোস্টেল টোস্টেলও হয় নাই। কেবল পার্লামেন্ট আরম্ভ হলো ১৯৬২ সালে। উনি আমার কাছে এসে বললেন– কথাটা ঠিক যা বলেছেন। তারপর বললেন, 'মিয়া, আমি যাই?' আমি বললাম, 'জানি তো, আপনি শপথ নিতে যাচ্ছেন। কেউ তো আমাদের জিজ্ঞাসা করে গেল না, আপনি তো অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি যান।'

তারপর বিভিন্ন কনফারেন্সে গেলে আমাদের সাথে দেখা হতো। কুশল বিনিময় হতো। আমার সঙ্গে উনার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। আর মানুষ হিসাবে আমি জানি উনি একজন আল্লাহভক্ত এবং একজন নামাজী মানুষ ছিলেন। কখনও আমি তাঁকে নামাজ কাযা করতে দেখতাম না। নামাজ রোজায় খুবই পায়বন্দ ছিলেন। আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধরেন, আমাদের বয়সের পার্থক্য ছিল এবং দলও তো আলাদা ছিল। কিন্তু উনার বিরুদ্ধে বলার মত কোন ঘটনা কোন সময় ঘটে নাই।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে ডিসপ্যারিটি ছিল, তা কমানোর চেষ্টা উনি করেছেন বলে কি আপনার মনে হয়?

জনাব চৌধুরী ঃ এটার কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমার নাই। তবে উনি যা, তার চেয়ে অনেকে অনেক কিছু ভুল বুঝাবুঝি করে ফেলেছে।

প্রশ্ন ঃ যেহেতু আপনিও একজন রাজনীবিদ, রাজনীতিবিদ হিসাবে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উনাকে কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন?

জনাব চৌধুরী ঃ উনি যে রাজনীতি করতেন, সে রাজনীতি উনি সততা, নিষ্ঠা এবং সত্যিকার মনপ্রাণ দিয়েই করতেন। এর মধ্যে কোনরকম ভেজাল বা কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। যেটা বুঝতেন সেটা করতেন এবং যেটাই বলতেন সেটাই করতেন। কোনরকম রাখঢাক উনার মধ্যে ছিল না। রাজনৈতিকভাবে উনি খুব সৎ ছিলেন। সে রাজনীতি আমার পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু উনি যে রাজনীতি করতেন, সে রাজনীতি উনি খুব নিষ্ঠার সাথেই করতেন। একজন মুসলমান হয়ে একজন মুসলমান সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে খুব হুঁশিয়ার হয়ে বলতে হবে। বেশিও বলা যাবে না কমও বলা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে উনার সাথে আমার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। উনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম একজন মুরুব্বি হিসাবে।

সাক্ষাতকার দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

জনাব চৌধুরী ঃ আপনাকেও ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

আবদুল মোনয়েম খান

ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার

১৯৬২ সালের ১১মে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন। তারপর তাঁকে ১৯৬২ সালের ২৫ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নর নিয়োগ করা হয় এবং ২৮ অক্টোবর তিনি গভর্ণর হাউজে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বর্তমান বঙ্গভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন গভর্ণর আযম খান কিন্তু এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত আবদুল মোনায়েম খান গভর্ণর পদের দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ৬টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন। এল. এম. এফ. ডাক্তারদের জন্য সংক্ষিপ্ত এম. বি. বি. এস কোর্স চালু এবং সাবেক আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করেন। যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামে সুপরিচিত।

পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং পাকিস্তান তৈরী হওয়ার পর ২২ জন গর্ভণরের মধ্যে তিনি দীর্ঘদিন গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর জেলা ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর থানার হুমায়ুনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জনাব করম আলী খান এবং মাতা মোছাঃ নছিবা খাতুন তিনি আদর্শ ব্যক্তিত্ব বলে গ্রামে সুপরিচিত ছিলেন। পিতা একজন বিশিষ্ট আলেম এবং হুমায়ুনপুর গ্রামের অবৈতনিক ইমাম হিসেবে ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় পান্ডিত্যের অধিকারী। বাজিতপুর শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐচ্ছিক অংকে লেটার মার্ক সহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ঐ কলেজ থেকে

www.pathagar.com

২য় বিভাগে বিএ পাশ করেন। ১৯২৪ সালে আইন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৭ সালে উকিল হিসেবে ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে মি. জিন্নাহ'র সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

উল্লেখিত আছে যে, বৃটিশ আমলে ময়মনসিংহ জেলা ছিল সবচেয়ে বড় জেলা এবং এই জেলা হিন্দু প্রতাপশালী রাজা মহারাজাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মুসলমান প্রজাদের হিন্দু রাজা ও জমিদাররা অত্যাচার করলে আবদুল মোনায়েম খান তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ময়মনসিংহ শহরে ঈদুল আযহার সময় রাজা মহারাজাদের নির্দেশে মুসলমানদের গরু কোরবানী নিষিদ্ধ ছিল। এর বিরুদ্ধে তিনি মুসলমানদের সংগঠিত করেন এবং ঈদুল আযহার দিনে প্রথম গরু কোরবানী করেন। তখনকার দিনে হিন্দু রাজা মহারাজা জমিদারদের বিরুদ্ধে এটি ছিল দুঃসাহসিক উদ্যোগ। ফলে তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার সময়ই শেরেবাংলা নগরের প্রতিষ্ঠা এবং সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ে কয়েকটি উচ্চতর ভবন, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, সুপ্রীম কোর্ট ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংক ভবন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক আধুনিক ভবন ও হল (যেমন নতুন কলাভবন, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জিন্নাহ হল (বর্তমানে সূর্যসেন হল), হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল, রোকেয়া হল, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ, ঢাকা চারুকলা কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাস, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই বিমান বন্দর উদ্বোধন করেন। জিপিও ভবন, এটোমিক এনার্জি সেন্টার, সাইন্স লেবরেটরী, পিজি হাসপাতাল সহ ৭টি মেডিকেল কলেজ, রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্র, বনানী, গুলশান, উত্তরা মডেল টাউন, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী,

www.pathagar.com

গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা, আশুগঞ্জ কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঝিনাইদহ, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, গ্রাফিক আর্ট ইনস্টিটিউট, ঘোড়াশাল সার কারখানা, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, ইস্টার্ন রিফাইনারী, বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট, টেলিফোন কারখানা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, নর্থবেঙ্গল পেপার মিল, খুলনা হার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরী, ইস্টার্ণ কেবলস ইত্যাদি তার আমলে শুরু হয় এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়। এছাড়া তার আমলে ১০টি চিনিকল, ১৬টি জুট মিল ও শতকরা ৮০টি টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয় সুগারকেইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ১৯৬৪ সালে গভর্ণর হিসেবে জনাব আবদুল মোনায়েম খান এটি উদ্বোধন করেন। তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান (বর্তমান সোনালী ব্যাংক) এর মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয় ৮ অক্টোবর ১৯৬৮, নাটোরের দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ীকে সংস্কার করে গর্ভমেন্ট হাউজ এ রূপান্তর ও উদ্বোধন, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন ১মে ১৯৬৭, শাহবাগের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১জুন ১৯৬৮; উত্তরা মডেল টাউন এর ভিত্তি ফলক উন্মোচন ৮জুন ১৯৬৭; বরিশাল মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন ২০ নভেম্বর ১৯৬৮; রংপুর মেডিকেল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৯ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ ইত্যাদি তার আমলের কীর্তি। ১৯৬৫ সালে গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খানের স্ত্রী বেগম রেবা আখতার খান তার নিজ অর্থ দিয়ে ময়মনসিংহ ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বঙ্গভবনের অভ্যন্তরের মসজিদ নির্মাণ করেন। মূল বঙ্গভবনের উদ্বোধন করেন গর্ভণর আবদুল মোনায়েম খান। তিনি ৭২ বছর বয়সে ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে ইন্তেকাল করেন।

[ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার রচিত পালরাজ থেকে পলাশী এবং
বৃটিশরাজ থেকে বঙ্গ ভবন, গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

(লেখক সাবেক মন্ত্রী, স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ)

www.pathagar.com

'অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব'

এ. এস. এম. সোলায়মান

[জনাব এ. এস. এম. সোলায়মান দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং পার্লামেন্ট্রিয়ান। তিনি পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য, প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ সংসদের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি ছিলেন।]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগনে এখন জনাব আবদুল মোনয়েম খান এক বিতর্কিক ব্যক্তিত্ব। দেশের শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদান থাকা সত্ত্বেও ষাট দশকের আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার প্রধান থাকায় তাঁহার সঠিক মূল্যায়ন হয় নাই। একটি বিশেষ মহল বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে জনাব আবদুল মোনয়েম খান সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার দুঃখজনক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইয়াছেন।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সর্বাধিক সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদে আসীন ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণরদ্বয় উভয় প্রদেশে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার ঢাকার এক জনসভায় তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাকে পাজামার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন ইহার উপরে একবচন ও নীচে দ্বিবচন। উপরে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং নীচে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণদ্বয়-জনাব আবদুল মোনয়েম খান ও কালাবাগের নবাব আমীর মোহাম্মদ খান।

পাকিস্তান শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন কোন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। মহান নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের পদ অলংকৃত করিয়াছেন। জাতীয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী তৎকালীন কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি জনাব আবু হোসেন সরকার পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বিশিষ্ট আইনবিদ, বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম (ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহম্মদের শ্বশুর) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সরকারের আমলে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াছেন। প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বকে তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও মূল্যায়ন করা একান্তভাবে প্রয়োজন বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গভর্ণর আবদুল আবদুল মোনয়েম খানের। শাসনামলকে নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও শিল্প উন্নতির ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বর্ণযুগ বলা চলে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল আযম খান 'চাষী ভাই ও জেলে ভাই' বলে সম্বোধন করা ছাড়া এদেশের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি আজো এদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী। একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আমাদের জানা, 'A great man is nevef honoured by his countryman. এজন্য মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁহার বংশীয় লোকদের অত্যাচারে পবিত্র মক্কা নগরী ছাড়িয়া মদিনায় হিযরত করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের মহাজ্ঞানী সক্রেটিসকে হেমলক বিষ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাধক পন্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে দেশবাসীর নির্যাতনে বাধ্য হইয়া তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মহামানব যিশুখৃষ্টকে দেশবাসীর অত্যাচারে ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদনদত্তকে দেশত্যাগ করিয়া ইউরোপে প্রবাস জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। মহান নেতা শেরে বাংলাকে তাঁহার নিজের জেলাতেই চরম অপমানিত হইতে হইয়াছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বরণ এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রমাণ করে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরূপ বেদনাদায়ক ঘটনার অভাব নাই। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া বিদেশী শাসনাধীনে থাকায় এতদ্দেশীয় শাসককে সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালী বলিয়া যাহাদের জন্য আমরা গৌরব বোধ করি, হিন্দু

www.pathagar.com

যুগের মহারাজ শশাংক, সেন বংশীয় রাজাগণ, মুসলিম যুগে সোনার গাঁ অধিপতি মনসদ-ই-আলি ঈসা খান, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (যাঁহার কবর সোনার গাঁয়ে অবস্থিত) স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃত নবাব সিরাজদ্দৌলা সবাই বহিরাগত ছিলেন। মহান নেতা শেরে বাংলা এ.কে ফজলুলহক ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক নির্বাচনকালে নোয়াখালীতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, 'বাংলাদেশ ভারত ভূখন্ডের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এদেশীয় আওলিয়া ও আলেম সমাজই এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। এদেশে বুজর্গ আলেমের অভাব নাই। এতদসত্ত্বেও দেশী আলেমদের আমাদের ভাল লাগে না, পশ্চিম হইতে আগত মূলার মত লাল চামড়াওয়ালা পীর ও মাওলানা সাহেবদের পানশী নৌকা ঠেলার জন্য বাঙ্গালী বড় মরদ। এত নির্যাতিত হওয়ার পরও পশ্চিমা নেতাদের জন্য আকর্ষন বাঙ্গালীর এখনো কমে নাই।'

জনাব আবদুল মোনয়েম খানের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক নির্বাচনকালে বাজিতপুরে। যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেনের জন্য যুক্তফ্রন্ট নেতা শেরে বাংলা বাজিতপুরে যান। যুক্তফ্রন্টের প্রধান সংগঠক হিসাবে আমাকে সে সময়ে শেরে বাংলার সাথে বাংলাদেশময় সভা সমিতি করিতে হইয়াছে। জনাব আবদুল মোনয়েম খানও বাজিতপুরে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। শেরে বাংলা প্রকৃতপক্ষে জনাব আবদুল মোনয়েম খানের বিরুদ্ধে সভা করিবার জন্যই বাজিতপুর গমন করেন। শেরে বাংলা বাজিতপুরে পৌছলে জনাব আবদুল মোনয়েম খান শেরে বাংলার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করেন। ইহাতে মুসলিম লীগ কর্মীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন, 'নির্বাচন সাময়িক ব্যপার। কিন্তু শেরে বাংলা দলমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নেতা।' রাজনৈতিক অঙ্গনে এই মূল্যায়ন এখনো দুর্লভ।

১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর জাতীয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। দেশবাসী শত শত টেলিগ্রাম মারফত শেরে বাংলার মাজারে শেরে বাংলার কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করিবার জন্য দাবী জানান। সে সময়ে পি. আই. এ. বিমান বৈরুতে যাতায়াত করিত না। জাতীয় নেতার লাশ বৈরুত হইতে আনার ব্যবস্থা করার জন্য জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), জনাব সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) এবং আমি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনয়েম খানের সহিত সাক্ষাত করিতে গভর্ণর ভবনে (বর্তমানে

www.pathagar.com

বঙ্গভবন) যাই এবং জাতীয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লাশ বৈরুত হইতে আনার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাই। এ সময়ে তৎকালীন জাতীয় সংসদের নেতা ও সিনিয়ার মন্ত্রী জনাব খান এ. সবুর, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল্লাহ-আল মাসুদ উপস্থিত ছিলেন। জনাব আবদুল মোনয়েম খান ও জনাব খান এ. সবুরের অনুরোধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পি. আই. এ. বিমানের গতি পরিবর্তন করিয়া বৈরুত হইয়া জাতীয় নেতার লাশ দেশে আনার নির্দেশ দেন। গভর্ণর জনাব আবদুল মোনয়েম খানের অনুমোদনক্রমেই জাতীয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে শেরে বাংলার মাজারের পাশে দাফন করা হয়।

১৯৬৬ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা জনাব নুরুল আমিন, ডিপুটি লীডার জনাব শাহ আজিজুর রহমান, সেক্রেটারী জনাব কামারুজ্জামান, সংসদ সদস্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর ইউসুফ আলী, খাজা খয়েরউদ্দিন, পীর মোহছেন উদ্দিন দুদু মিয়া, বরিশালের শাহজাহান চৌধুরী ও চীপ হুইপ হিসাবে আমি ইস্ট পাকিস্তান হাউসে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময়ে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান রাওয়ালপিন্ডি সফরে আসিয়া তাঁহার জন্য সংরক্ষিত ইস্ট পাকিস্তান হাউসের স্যুটে উঠেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য জনাব নুরুল আমিনের স্যুটে আসেন। সেই সময়ে আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম। আমি কথা প্রসঙ্গে জনাব আবদুল মোনয়েম খানকে প্রশ্ন করি, 'পূর্ব পাকিস্তানে বড় লোকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য দেশে ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকথা কোথায়? তিনি সহাস্যে জবাব দেন, 'চাকুরীতে কোটা দাবী করিয়া অধিকার আদায় করা যায় না। প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে আমাদের ছেলেরা সি. এস. পি. হইতে পারে না। সামরিক অফিসারের চাকুরী হইতেও তারা বঞ্চিত। আমার ক্যাডেট কলেজের ছেলেরা এ অভাব পূরণ করিবে।' এই উক্তি নিঃসন্দেহে দেশবাসীর জন্য তাঁহার অসীম মমত্ববোধ ও অকৃতিম দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। জনাব আবদুল মোনয়েম খান তাঁহার শাসনামলে দেশে ছয়টি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আজ আমরা ইহার যৌক্তিকতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করি। তিন চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আটটি মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করিয়াছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার এই অসামান্য অবদান আজ বিস্মৃত। কোন প্রতিষ্ঠানেই তো তাঁহার ছবি শোভা পায় না। রাজধানী ঢাকা শহরের শেরে বাংলা নগরস্থ সংসদ ভবন, ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের সুবিশাল অট্টালিকা, ঢাকা

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (বর্তমানে জিয়া বিমানবন্দর), কমলাপুর রেলস্টেশন, সদর ঘাটের বিশার জাহাজঘাট তাঁহারই স্মৃতি বহন করে। আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের শাসনামলে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রচিত হইয়াছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরেও আমরা সে ধারা রক্ষা করিতে পারি নাই। বাংলাদেশের একমাত্র স্টিল মিল, একমাত্র অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, ডিজেল প্ল্যান্ট, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিস্ট্রজ, রিফাইনারী, তিনটি সার কারখানা, পাঁচটি কাগজের মিল, শতাধিক পাট ও কাপড়ের কল তাঁহারই শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান রাজনীতি ও তাঁহার কর্মবহুল জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুলিশ প্রহরা ব্যতীত সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় তাঁহার বনানীস্থ বাসভবনে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে দেশের রাজনীতির সাথে তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এতদসত্ত্বেও ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি তাঁহার বনানীস্থ বাসভবনে আততায়ীর গুলীতে গুরুতর আহত হন। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেই সময়ে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিবার পরিকল্পনা ফেডারেশনের সভায় যোগদানের জন্য লন্ডন ছিলাম। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জনাব আবদুল মোনয়েম খানকে দেখিতে গেলে তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আজীবন আমার কওমকে সেবা করার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি আহত অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা হাসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে পড়িয়া আছি, একজন ডাক্তারও আমার নাড়িটা ধরিয়া দেখিল না।

মানবতা বিরোধী এই কলংক-কালিমা জাতি হিসাবে আমাদের বহন করিতে হইবে। এই করণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের একাধিক জাতীয় নেতার ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই বেদনাদায়ক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটুক ইহাই একান্তভাবে কামনা করি।

www.pathagar.com

একজন মর্দ্দে মুমিনের জীবনালেখ্য

মওলানা মুহীউদ্দিন খান

[মওলানা মুহীউদ্দীন খান একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং লেখক। বহুল প্রচারিত ইসলামী মুখপত্র 'মাসিক মদীনা'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক। বর্তমানে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর নির্বাহী সভাপতি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান]

ইংরেজ শাসনের শেষ পাঁচটি দশক ছিল মুসলিম বাংলার জাগরণের কাল। অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর নতুন সুর্যোদয় হয়েছিল বাংলার কৃষিজীবী মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে নতুন অরুণ উদয়ের আভাস নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইতিপূর্বেকার প্রায় দেড়শত বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং দেশীয় শোষকগোষ্ঠীর সম্মিলিত শোষণ শাসনের ফলশ্রুতিতে বাংলার মুসলমান সমাজ যথার্থ অর্থেই একটি ভূমিদাস জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব-বাংলার এই অসহায় গরীব মুসলিম কৃষিজীবী লোকগুলি সম্পর্কেই এক দাম্ভিক হিন্দু বুদ্ধিজীবির দম্ভোক্তি হচ্ছে, "ভূমি সংলগ্ন মুসলিম কৃষকদেরকে আমরা গৃহপালিত গবাদি পশু বলেই জ্ঞান করতাম।"

আসলেও তখনকার কৃষিজীবী মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে বলতে গেলে বোবা জীবজন্তুর স্তরেই চলে গিয়েছিল। সরকারী পদ-পদবী ওয়ালাদের নিকট যেমন তাদের কোন স্থান ছিল না, তেমনি ছিল না তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা। মার খেয়েও তারা কথা বলতে পারতো না। অচিন্ত্যনীয় শোষণ নির্যাতনের প্রতিবাদ করার ভাষা তারা জানতো না। ছিলনা তাদের কোন সাংগঠনিক শক্তি। ছিল না কোন প্রচার মাধ্যমও। পতনের এই শেষ স্তর থেকে বাংলার মুসলমানদের পুনরুত্থান এবং উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত ও পশ্চাৎপদ এ অঞ্চলকে মুসলিম শাসিত একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অংশে পরিণত করার কৃতিত্বের যাঁরা দাবিদার, কৃষিনির্ভর এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নব-জাগ্রত সূর্যসৈনিকদের মাঝে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনয়েম খান তাঁদের একজন। এঁরা শোষনের বিরুদ্ধে বুকটান করে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বজাতি প্রেমে, জাতীয়তাবোধে এবং ঈমানের বলে এক একজন অগ্নিপুরুষ। সর্বোপরি এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল–ধর্মীয় চেতনায় এঁরা সবাই ছিলেন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও স্বজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত-প্রাণ। অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি যে, এঁরাই ছিলেন আমাদের পিতৃ-পুরুষ। উন্নত চরিত্রে, কর্মনিষ্ঠায় এবং ধর্মসাধনায় এঁদের

www.pathagar.com

অনেকেই এমন এক একটি অনির্বাণ আলোর শিখা নির্মাণ করে গেছেন, যা এতদঞ্চলের মুসলিম জনগণের জন্য চির অনুসরনীয় হয়ে থাকবে।

আবদুল মোনয়েম খান এবং তাঁর সতীর্থদের শিক্ষা জীবনের শুরু হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তখনকার বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার মুসলিম সন্তানদের লেখা পড়ার পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত একটা কাহিনী আমরা শুনেছি মুরুব্বীগণের মুখে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

গফরগাঁয়ের বিশিষ্ট একজন সমাজপতি জনাব নসর উদ্দীন খান তাঁর কোন এক আত্মীয়ের একটি ছেলেকে পার্শ্ববর্তী ধলা স্কুলে নিয়ে যান। তখনকার সময়ে ধলা স্কুলই ছিল সেই অঞ্চলের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ধলার প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি খান সাহেবের একান্ত অনুরোধে ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করতে রাজী হলেন। কিন্তু কিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে বললেন, "ওকে তো আর 'ভদ্রসন্তানদের' সাথে একই বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া যাবে না; না হয় পৃথক একটা টুলের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে! কিন্তু ওকে ভদ্রলোকের পোশাক পরে স্কুলে আসতে হবে। আমি কোন যবন সন্তানকে চুঙ্গা আর বালতি পরে স্কুল আঙ্গিনায় প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারবো না।" উল্লেখ্য যে, প্রধান শিক্ষক মশায়ের দৃষ্টিতে "ভদ্রলোকের পোশাক" ছিল ধূতি বা হাফপ্যান্ট। মুসলমানের বুনিয়াদি পোশাক পাজামা এবং ফেজ টুপীকেই তিনি ব্যঙ্গ করে চুঙ্গা আর বালতি বলে অভিহিত করেছিলেন।

গফরগাঁয়ের কৃতিপুরুষ নসরউদ্দিন খান আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া বেশি জানতেন না। কিন্তু তাঁর ধমনীতে ছিল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলিম রক্তের প্রবাহ। তিনি তাঁর আত্মীয়ের সন্তানকে মুসলমানী পোশাক বাদ দিয়ে তথাকথিত ভদ্রলোকের পোশাক পরাতে রাজী হলেন না। বাড়ী ফিরে এসে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন– প্রতিষ্ঠা করলেন গফরগাঁও ইসলামিয়া হাই স্কুল। এটা ছিল এতদঞ্চলের লুঙ্গি পাজামা পরা কৃষক সন্তানদের স্কুল। কিন্তু তাতেও বখেরা। ইসলামিয়া হাই স্কুল নাম রাখা যাবে না। মঞ্চুরী আটকানো হলো। কিন্তু নসর উদ্দীন খান ও তাঁর সহকর্মীরা দমলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ইসলামিয়া হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ছাড়লেন। আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন নসরউদ্দিন খানের বিশেষ স্নেহের পাত্র। উনার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীর একান্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আবদুল মোনয়েম খান পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ইসলামিয়া হাইস্কুলের পার্শ্বে গফরগাঁও কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য যে, আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন গফরগাঁও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করতে হয় যে, মর্দ্দে মুজাহেদ আবদুল মোনয়েম খানের পোশাক ছিল চুস্ত পাজামা-পাঞ্জাবী বা শেরওয়ানী। আমি তাঁকে শেরওয়ানীর সাথে

www.pathagar.com

ফেজ টুপী পরতেও দেখেছি। পোশাক-পরিচ্ছেদে তাঁকে একজন গর্বিত মুসলিম সন্তানের সাচ্চা ঐতিহ্যধারী বলে মনে হতো।

আবদুল মোনয়েম খান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন ধর্মভীরু মানুষ। নামায-রোযার পায়বন্দ ছিলেন তিনি। ধার্মিকতা ছিল তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার। তিনি বিয়ে করেছিলেন গফরগাঁও থানার সতেরোবাড়ী গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মিয়াবাড়ীতে। মিয়াবাড়ীর শতাব্দী পুরাতন মসজিদটি ছিল এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ জনগণের একটি বড় আকর্ষনীয় প্রতিষ্ঠান। সব সময় এখানে কোন না কোন একজন বিজ্ঞ আলেম থাকতেন। মিয়াদের আগ্রহে দেশ-বিদেশের ওলামা-মাশায়েখগণও আসা-যাওয়া করতেন। রমযান মাসে তারাবীর জামাত হতো।

মসজিদের মিনারার উপর ছিল মস্তবড় একটা ঢাক। সেই ঢাকের আওয়াজ শুনে লোকেরা সেহরী খেতো, ইফতার করতো। আমাদের বাড়ি সতেরোবাড়ী থেকে অন্তত ছয় মাইল দূরে। এতদূর থেকেও মিয়াবাড়ীর ঢাকের আওয়াজ শোনা যেতো। সেহরীর সময় শেষ রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সে আওয়াজ দূরের মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছাতো। অনেক দূরের সেই আওয়াজকে কেন্দ্র করে একটা পবিত্রতার আবহ ছিল এতদঞ্চলের সর্বত্র। মিয়ারা নিজেরা যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তেমনি এলাকার ধর্মীয় কাজকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রেও তাঁদের খ্যাতি ছিল। সেই মিয়াবাড়ীর পুণ্যবতী কন্যা বেগম রাবেয়া খাতুন ছিলেন জনাব আব্দুল মোনয়েম খানের সহধর্মিনী। এই মহীয়সী মহিলা প্রায় অর্ধযুগ কাল গভর্ণর হাউসে বসবাস করে গেছেন। কিন্তু কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর ছায়াটিও বাইরের কেউ দেখতে পায়নি। এমনি পর্দানশীল ছিলেন তিনি।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান ভাল ফার্সী জানতেন। বক্তৃতায় অনেক সময় তিনি ফার্সী কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। তাঁর ফার্সী উচ্চারণ শুদ্ধ ছিল। তেমনি শুদ্ধ ছিল তার পবিত্র কোরআন পাঠও। বাংলা ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করে জাতির মানস গঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতেন। তদানিন্তন কালে দেশের একটা সেরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের মালিকানাধীন। তিনি সে প্রতিষ্ঠানের মালিককে ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করার জন্য বিশেষ তাকিদ দিতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তখনকার জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো এবং বাংলা একাডেমীর কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ পোষণ করতেন। তাঁর আগ্রহের আতিশয্য দেখেই তখনকার বাংলা একাডেমী বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করেছিল। তাঁর খুব বড় স্বপ্ন ছিল আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা। তাছাড়া মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ শহরের রাবেয়া খাতুন মহিলা ক্যাডেট স্কুল ছিল সেই স্বপ্নের কিছুটা

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন প্রয়াস।

জনাব আবদুল মোনয়েম খানের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহ শহরকে কেন্দ্র করে। তখনকার সমাজ-জীবনের সবচাইতে বড় একটা উপসর্গ ছিল– শহর-বন্দর এমনকি বাজার-হাটগুলিতে পর্যন্ত গণিকালয়ের ছড়াছড়ি। এমনকি গ্রাম্য বাজারগুলিতে পর্যন্ত দু'চারঘর গণিকা থাকা যেন অপরিহার্য ছিল। শোনা যায়, বৃটিশ কুশাসন আমলে সামন্তশ্রেণী এবং জমিদার কাচারীর আমলা-বরকন্দাজরাই ছিল গণিকালয়গুলির বড় পৃষ্ঠপোষক। ওরা ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য শোষণমূলক কর-খাজনার সর্বাপেক্ষা বড় জোগানদার কৃষক শ্রেণীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার মন্দ উদ্দেশ্যে গণিকাপল্লীর ছড়াছড়ি ঘটিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, কৃষক শ্রেণীর উপর জমিদারী অত্যাচার নির্যাতনের বাড়াবাড়িটা মোমেনশাহী জেলাতেই বেশি ছিল। এদের রকমারী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন এ জেলারই এক কৃতি সন্তান জনাব খানবাহাদুর মুহম্মদ ইসমাঈল। তিনি মোমেনশাহী বারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। তাঁর সময়কালে মোমেনশাহী বারে আর কোন মুসলিম আইনজীবীর অস্তিত্ব ছিল কি না তা বলা মুশকিল।

খানবাহাদুর ইসমাঈল সাহেব গরীব কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে যে প্রতিবাদী ভূমিকার সূচনা করেছিলেন, সে মহৎ প্রয়াসেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন সমাজগতপ্রাণ জনাব আবদুল মোনয়েম খান, জনাব নূরুল আমীন, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খান, জনাব ফখরউদ্দীন, মাওলানা শামছুল হুদা পাঁচবাগী, জনাব গিয়াস উদ্দীন পাঠান, সাংবাদিক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব মুজীবুর রহমান খান ফুলপুরী প্রমুখ কৃতিপুরুষেরা। জমিদার বিরোধী আন্দোলনেরই অংশ হিসাবে জনাব আবুদল মোনয়েম খান প্রমুখ আলেম সমাজকে সঙ্গে নিয়ে নিষিদ্ধ পল্লী উৎখাতের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই উদ্যোগ অনেকটাই সফল হয়েছিল। অন্ততঃ পল্লীর হাট-বাজারে এমনকি থানা সদরের বাজারগুলি থেকে নিষিদ্ধপল্লী উৎখাত হয়েছিল। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে অশ্লিল যাত্রা, সার্কাস এবং জুয়ার আসরের বিরুদ্ধেও জনাব আবদুল মোনয়েম খানের আন্দোলন ছিল নিরাপোষ।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ বিভক্ত হওয়ার সাথে সাথে একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে দেশের 'আদিবাসী' অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকাগুলিতে। একশ্রেণীর দেশীয় বামনেতা এবং বিদেশী মিশনারীদের যোগসাজশে রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতাল এবং উত্তর মোমেনশাহীর গাড়ো-হাজং প্রভৃতি আদিবাসীদের উস্কানী দিয়ে বিদ্রোহ সংগঠনের আয়োজন করা হয়। গাড়ো-হাজংরা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীর বরাবর একটি বিরাট এলাকা নিয়ে তথাকথিত আদিস্থান প্রতিষ্ঠার ধুয়া

www.pathagar.com

তোলে। এদের এ ষড়যন্ত্রের ফলে সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার মুসলমান কৃষক পরিবার পিতৃ-পিতামহের ভিটাবাড়ী থেকে উৎখাত হওয়ার উপক্রম হয়। তথাকথিত কমিউনিস্ট বিপ্লবী এবং বিদেশী মিশনারীরা সহজ সরল গাড়ো-হাজংদের মারমুখী ভূমিকায় নিয়ে আসে। স্থানে স্থানে ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলির উপর হামলা পরিচালনা করতে থাকে। সেই ভয়াবহ অবস্থায় আবদুল মোনয়েম খান "জমিয়তে হেজবুল্লাহ" নামক একটি ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেন এবং দলে দলে প্রচারকদল সীমান্ত এলাকাগুলিতে প্রেরণ করতে থাকেন। এই প্রচারক দলের দায়িত্ব ছিল উপজাতীয় গাড়ো-হাজংদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং নিরীহ গরীব মুসলিম কৃষকদের মনে সাহস সৃষ্টি করা। কিছুটা সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং প্রধানত প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাবে হেজবুল্লাহর কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি সত্য, তবে এই সংগঠনের কর্মীদের প্রচেষ্টায় যেমন কিছু সংখ্যক গাড়ো-হাজং পরিবার ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, তেমনি কমিউনিস্টদের উস্কানীতে সীমান্ত এলাকা থেকে মুসলিম আধিবাসীদের বিতাড়নের অপপ্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, জনাব আবদুল মোনয়েম খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী হেজবুল্লাহর কার্যক্রমের প্রতি যদি যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হতো তবে সম্ভবতঃ আজকের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্ভব হতো না, জাতিকেও এর জন্য এত উচ্চ মূল্য দিতে হতো না।

সমাজ-নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা ইসলামের বোধ-বিশ্বাস ও জীবনাচরণের পক্ষশক্তি রূপে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন, তাঁদের চরিত্র হনন, তাঁদেরকে দেশ ও দশের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার মত লোকের কোন অভাব নাই। এটাই উপমহাদেশীয় মুসলমানদের ভাগ্যলিপি। দরবেশ সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচিত হয়েছেন একশ্রেণীর তথাকথিত ইতিহাস বিশ্লেষকের লেখনীতে। অপর পক্ষে যেসব রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের নিকট আত্মসমর্পন করে মুসলিম জাতিসত্তার চরম সর্বনাশ করে গেছেন, ইতিহাসের পাতায় তাদের প্রশংসা কীর্তনের কোন অভাব নাই। তবে ঈমানদার মানুষের নিকট আলমগীর আওরঙ্গজেব ও তাঁর স্বগোত্রীয়গণ "জিন্দাপীর" রূপেই বিবেচিত হয়ে থাকেন। সে মতে স্বজাতিবান্ধব আবদুল মোনয়েম খান তাঁর সুকৃতিতে, পুণ্য সাধনায় এবং বহুমুখী কীর্তিকর্মের মধ্যেই চিরকাল বেঁচে থাকবেন; যেমন জনচিত্তে চিরশ্রদ্ধার আসন নিয়ে বেঁচে আছেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ, ঈসা খাঁ মসনদে আলা প্রমুখ মুসলিম-বাংলার প্রকৃত বীর সন্তানেরা। এমন একদিন আসবে, যখন অনেক মিথ্যার আবরণ অপসারিত হয়ে প্রকৃত সত্য ভাস্বর হয়ে উঠবে। এ জাতির পরবর্তী বংশধর তাঁদের পিতৃ পুরুষদের যাবতীয় কীর্তি-গাঁথার যথার্থ মূল্যায়ন করে গৌরব বোধ করবে।

www.pathagar.com

তিনি এদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের স্থপতি

বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী

[জনাব বি.এ. সিদ্দিকী পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের শেষ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর কয়েক বছর বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর তিনি জাতিসংঘে, বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য, ঝলমলে এবং দুঃসাহসী। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় লেঃ জেনারেল টিক্কাখানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে শপথ না দিয়ে তিনি দেশে ও বিদেশে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ঢাকার অদূরে বিখ্যাত বলিয়াদী জমিদার বাড়ীর সন্তান কীর্তিমান বি.এ. সিদ্দিকী ৩ রা ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে ইন্তিকাল করেন।

১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে জনাব বি.এ. সিদ্দিকীর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন জনাব আতিকুল ইসলাম।

প্রশ্ন ঃ স্যার, প্রথমেই আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ আমি গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান সম্পর্কে জানতে এসেছি। আপনি কি স্যার উনার সম্পর্কে কিছু বলবেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ কেন বলবো না। আপনি তাঁর সম্পর্কে কি জানতে চান?

প্রশ্ন ঃ তাঁকে আপনি কখন থেকে জানেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ তিনি আমার অনেক সিনিয়ার। পেশায় আমরা দু'জনই আইনজীবী। সম্ভবতঃ ১৯২৭ সালে ময়মনসিংহ জিলা আদালতে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। তখন ময়মনসিংহে মাত্র দু'তিনজন মুসলমান আইজীবী ছিলেন। আমি কলিকাতা হাইকোর্টে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন জুনিয়ার হিসাবে আইন ব্যবসা শুরু করি। ঐ সময়ই শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পন্ডিত আবুল হাশিম, মাওলানা আকরাম খাঁর মতো বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মুখে ময়মনসিংহ মুসলিম লীগের সেক্রেটারী আবদুল মোনয়েম খানের নাম শুনেছি বহুবার। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার পর ঢাকায় এবং ময়মনসিংহে উনার সংগে প্রায়শঃ দেখা

www.pathagar.com

হতো। আমার জানা মতে এদেশে তিনিই একমাত্র আইনজীবী ছিলেন যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রী গ্রহণ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পুনরায় আইন ডিগ্রী লাভ করেছেন। বলতে গেলে ১৯৪৩ সাল থেকেই উনাকে জানি।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তি হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ সার্বিক অর্থেই তিনি ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, অকুতোভয়, ধর্মপ্রাণ, কর্মঠ এবং আন্তরিক। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বমহলে আজও স্বীকৃত।

প্রশ্ন ঃ গভর্ণর হিসাবে তিনি কতটুকু সফল বলে মনে করেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে। আপনারা হয়তো জানেন না যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্তির সময় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, মোহিনী মিলস ও ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানে আর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো না। সব বড় ব্যবসায়ীরাই ছিলেন হিন্দু। ব্যবসা বাণিজ্য কোন কিছুই বাঙ্গালী মুসলমানদের হাতে ছিলো না। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী হিন্দুরা ভারতে চলে গেলেন। ফলে বেসরকারীভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করার মতো কোন সুযোগ ছিলো না।

উপরন্ত ১৯৪৭ সাল থেকেই মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীরা মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকও তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টি পুনরুজ্জীবিত করেন। 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় এবং এই 'ফ্রন্ট' ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সরকার গঠন করে। এই সরকারের অবস্থা হয় আরো করুণ, আরো শোচনীয়। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের বিরোধ এমন চরমে উঠে যে শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন দু'গ্রুপের মারামারির ফলে ডিপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এরপর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ফলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করেন।

নেতৃবৃন্দের বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর হানাহানির ফলে সৃষ্ট চরম রাজনৈতিক বিশৃংখলার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির ১১ বছরের মাথায় দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। এই এগারো বছর বিভিন্ন সরকারের অস্থিতিশীলতা আর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখ করার মতো কোন উন্নয়ন বা অগ্রগতি হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৬২ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভ করে। এম. এন. এ (মেম্বরার অব ন্যাশনাল এসেম্বলী) হিসাবে নির্বাচিত জনাব আবদুল মোনয়েম খান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। সম্ভবতঃ এর তিন মাস পরই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান গভর্ণর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পরই পূর্ব পাকিস্তানে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। মাত্র সাত বছরের শাসনামলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি প্রদেশ হিসাবে গড়ে তোলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, শিল্প কারখানা স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজসহ প্রাইমারী পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সব কয়টি সেক্টরকে সমানভাবে উন্নয়ন করেন। সাত বছরের সময় সীমার মধ্যে তিনি যে বিপুল উন্নয়ন ও অগ্রগতি করেছেন তা বিস্ময়কর। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়জন মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্ণর কাজ না করে বাজেটে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ অর্থই কেন্দ্রে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। একমাত্র মোনয়েম খানই বাজেটে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ উন্নয়ন আর অগ্রগতির জন্য ব্যয় করেছেন, এমনকি কোন কোন সময় কেন্দ্র থেকে বাজেট বহির্ভূত অর্থ এনেছেন শুরু করা প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য।

এ প্রসংগে একটি ঘটনা বলি। তাঁর সময়ে পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সে সময় আমি গভর্ণরের সংগে দেখা করে আইনজীবীদের জন্য 'বার লাইব্রেরী, নির্মাণের অনুরোধ করি তাঁকে। তিনি নতুন ভবনের নীচতলার একটি অংশে 'বার লাইব্রেরী' করার কথা বললে আমি আপত্তি জানিয়ে নির্মাণাধীন ভবনের পশ্চিমের খালি জায়গায় 'বার লাইব্রেরী' নির্মাণের প্রস্তাব করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, হাইকোর্ট ভবনের স্থাপত্যের সংগে সংগতি রেখে আপনার প্রস্তাবিত জায়গায় একটি দোতলা 'বার লাইব্রেরী' নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য কালই আমি নির্দেশ দেবো। তাঁর এই তড়িৎ সিদ্ধান্তে আমি বিস্মৃত হয়ে প্রয়োজনীয় তহবিলের কথা জানতে চাইলে তিনি হেসে বললেনঃ জজ সাহেব, 'বার লাইব্রেরী' নির্মাণের জন্য কোন তহবিল নেই। তবে ভাববেন না, তহবিল আমি ঠিকই কেন্দ্র থেকে যোগাড় করে নেবো ইনশাআল্লাহ। এবং তিনি তাই করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি সব কাজেই এমন তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ তাঁর কাজের ধরন দেখে তো তাই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলি সম্পর্কে কি কিছু বলবেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ তাঁর সবকয়টি কাজই উল্লেখযোগ্য। পূর্ণ তালিকা

www.pathagar.com

দেয়া সম্ভব নয়। সেই সময়ের পত্র পত্রিকা এবং সরকারী নথীপত্র দেখলে সবই পাবেন। সব চেয়ে ভালো হয় যদি বাংলাদেশের সর্বত্র চোখ বুলান। নির্মিত যা কিছু সুন্দর, অনুপম, নান্দনিক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে তার সবকয়টিতেই গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের সৃজনশীল হাতের স্পর্শ খুঁজে পাবেন।

আমার দৃষ্টিতে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান তিনটি। প্রথমতঃ প্রদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ইরি ধানের প্রকল্প চালু। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃতীয়তঃ প্রদেশকে শিল্পায়নের পথে এগিয়ে নেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত সব কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো লাভজনক। তাঁর আমলে শুধু কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃষি উপকরণের জন্য ভর্তুকী দেয়া হতো 'অধিক খাদ্য ফলাও' কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে।

প্রশ্ন ঃ গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের শাসনামলের পূর্বে এদেশে কি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানা গড়ে উঠেনি?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আপনাকে আবার অতীতের দিকে তাকাতে হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর এদেশের বিত্তবান ও ব্যবসায়ী হিন্দুরা ভারতে চলে যান। তখন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর দিল্লীর কংগ্রেস সরকার পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে নি। ফলে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের উভয় প্রদেশ দারুণ আর্থিক সংকটে পড়ে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার তাদের কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারে নি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশে সে সময় ইস্পাহানী গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ তিন মাসের বেতনের টাকা প্রদান করে প্রাদেশিক সরকারকে।

এমন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ এবং ইস্পাহানীর মতো অবাঙ্গালী ভারতীয় মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তান শিল্প কারখানা স্থাপন করতে শুরু করে। শিল্প কারখানা স্থাপন করার মতো নগদ টাকা পূর্ব পাকিস্তানের কোন বাঙ্গালী মুসলমানদের তখন ছিলো না।

১৯৬২ সালের পর গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানই বাঙ্গালী মুসলমানদের শিল্প কারখানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁরা এগিয়ে আসেন। ইতিহাস বলে যে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর আমলেই কলকারখানা বা ইন্ডাষ্ট্রিজ ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে কোন কোন মহল গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের অবদানকে

www.pathagar.com

শুধু অস্বীকারই করছে না উপরন্তু তাঁকে নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে– এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ কাউকে মূল্যায়ন করতে হলে সীমাবদ্ধতা আর হীনমন্যতার উর্ধে উঠতে হয়; উপরন্তু যিনি মূল্যায়ন করবেন তাঁকে অবশ্যই প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে এবং তাঁর মধ্যে থাকতে হবে একজন বিচারকের গুণাবলী। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা সবাই বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে চাই। যাই হোক, গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান নিহত হয়েছেন। তাঁর অবদানকে স্বীকার করলে তিনি আর ক্ষমতায় ফিরে আসবেন না। কিন্তু যাঁর যা প্রাপ্য তা তাঁকে দিতেই হবে। ঐতিহাসিক অবদানকে অস্বীকার করলে পরবর্তীতে কেউ আর দেশের জন্য কোন অবদান রাখতে আগ্রহী হবেন না। যাঁরা গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের অবদান আর সৃষ্টিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন তাঁদেরকে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে এজন্য যে মোনয়েম খানকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে হলে তাঁর সকল সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে হবে।

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের বহু সৃষ্টির মধ্যে একটির কথাই উল্লেখ করবো। আমি বহু দেশ সফর করেছি। উন্নত-অনুন্নত বহু দেশ দেখার সুযোগ হয়েছে এবং সেই সুবাদে বহু কিছু। কিন্তু শের-এ-বাংলা নগরে নির্মিত সংসদ ভবন এবং সংলগ্ন কমপ্লেক্স-এর মতো তেমনটি কোন দেশে দেখিনি। পৃথিবীর অনন্য সাধারণ স্থাপত্য শৈলীর অনুপম সৌন্দর্যের নিদর্শন এই সংসদ ভবনটিও মোনয়েম খানের আমলেই তৈরী।

এছাড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (যা আজ জিয়া বিমানবন্দর নামে পরিচিত), কমলাপুর রেলস্টেশন, হাইকোর্ট ভবন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ, শিল্প কারখানা ইত্যাদির সবই গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের সৃষ্টি। দীর্ঘ সাত বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানের ক্যানভাসে তিল তিল করে তিনি যে নান্দনিক চিত্রাবলী অংকন করে গেছেন তা মুছে ফেলার কোন অবকাশ বা সুযোগ নেই। বরং মুক্ত আর উদার মনে বাংলাদেশকে বিশ্লেষণ করলে একটি সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে যে মোনয়েম খানই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের স্থপতি। তাঁর অবদান আর সৃষ্টির ফসল আজ বাংলাদেশের জনগণই ভোগ করছেন– অন্য কেউ নয়।

প্রশ্ন ঃ স্যার, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের সময় কি সেই বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিলো?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারগুলোই সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলো। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সবকয়টি সরকার প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ কেন্দ্রে

www.pathagar.com

ফেরৎ দিয়েছেন। পরিকল্পিতভাবে অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ বা উৎসাহ কোনটাই ছিলো না। প্রতি বছরই অর্থ ফেরৎ দিয়েছে এবং পরবর্তী বছরে সঙ্গত কারণেই অর্থ বরাদ্দ আরো কমেছে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পারস্পারিক বিরোধের কারণে নিজেদের অবস্থান সামলাতে নেতারা এতই ব্যস্ত থাকতেন যে প্রতি বছর যে বরাদ্দের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা তলিয়ে দেখার ফুসরৎ তাঁদের ছিলো না। ফলে ধীরে ধীরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত সমুদয় অর্থ উন্নয়ন আর অগ্রগতির জন্য ব্যয় হতে থাকে। এমনকি প্রতি বছর বরাদ্দ বহির্ভূত প্রকল্প গ্রহণ করে কেন্দ্রের প্রতি তিনি চাপ প্রয়োগ করেছেন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য, ফলে বৈষম্য অনেক কমে এসেছিলো। এ প্রসংগে আমার ব্যক্তিগত একটি অনুভূতি ব্যক্ত করছিঃ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যদি জনাব আবদুল মোনয়েম খানকে দায়িত্ব দেয়া হতো তাহলে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান সার্বিক অর্থেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অঞ্চল হিসাবে দাঁড়িয়ে যেত এবং এর ফসল আজকের বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারই ভোগ করতো।

পাকিস্তান অর্থনৈতিক কাউন্সিলের বৈঠকে পর প্রাপ্ত অর্থের ব্যাংক-চেক হাতে না নিয়ে তিনি কখনোই ঢাকায় ফিরতেন না। এ সম্পর্কে আমার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সংগে আলোচনার জন্য আমি তখন ইসলামাবাদে। শুনলাম গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান অসুস্থ। আমি তাঁকে দেখতে ইষ্ট পাকিস্তান হাউসে গেলাম। তিনি শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। বললেন ঃ দু'দিন থেকেই জ্বরে ভুগছি। ঢাকায় কবে ফিরছেন প্রশ্নের জবাবে বললেন ঃ চেকটি আজকে পেলে আজকেই চলে যাবো। সব শুনে বুঝলাম যে এই বান্দার যত অসুখই থাকুক বরাদ্দের চেকটি হাতে না নিয়ে ঢাকায় ফিরবেন না।

এ সময় গভর্ণরের একজন অফিসার (নামটা তখন জেনে রাখার প্রয়োজন অনুভব করিনি) এসে বললেন যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তারবেলা বাঁধ উদ্বোধন করবেন আগামীকাল। গভর্ণর সাহেবকে সংগী হিসাবে পেলে প্রেসিডেন্ট খুশী হবেন। এ কথা শুনেই তিনি রেগে গেলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "জজ সাহেব 'তারবেলা'। তাঁর (প্রেসিডেন্ট আইয়ুব) বেলা তো সবই। আমার বেলা; আমার বেলা কি? বাঁধ কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের দরকার, আমাদের কি কোন বাঁধের দরকার নেই?"

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ স্যার, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের বিরোধিতা করতেন কেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ এ প্রসংগে উনার সংগে আমার যে আলাপ হয়েছিলো তা বলছি। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে লাট ভবনে উনার সংগে আলাপ করছি। এ সময়টাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীটি বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অংগনে। প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীর গায়েও এই দাবীর হাওয়া ধাক্কা দিচ্ছে। আমি তাঁকে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করার অনুরোধ করি। জবাবে তিনি বললেন ঃ জজ সাহেব, স্বায়ত্ত শাসনের দাবীটি উত্থাপনের সময় এখনো হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান এখনও দুর্বল এবং নির্ভরশীল। ১৯৭০ সাল থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা আমি করেছি। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আল্লাহ যদি আমাকে গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবার তৌফিক দেন তাহলে ১৯৭৫ সালের শেষ নাগাদ আমি পূর্ব পাকিস্তানকে সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রদেশ হিসাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। যেদিন আমরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে যাবো সেদিনই ইসলামাবাদ সরকারের কাছে আমি দাবীটি উত্থাপন করবো। ১৯৭৫ সালের পূর্বে এ ধরনের দাবী কার্যকরী হলে মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর বিরোধিতা ছিলো তাঁর কৌশলগত। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করার পূর্বে এই দাবী সমর্থন করেননি। অবশ্য এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভংগী।

প্রশ্ন ঃ গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে তিনি কি বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করেছেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ কখনোই নয়। তিনি তো শুধু গভর্ণর ছিলেন না। মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন আইনজীবী। উপরন্ত সে সময় বিচার বিভাগের উপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করার কোন বিধান বা প্রচলন ছিলো না। ৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মনোনীত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ দেইনি। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত কার্যকরী না করার কারণে আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপসারণ করা হয়নি।

যাক্‌গে, এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছি ঃ

অনেক মামলায় মোনয়েম খানের প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছি। একটি মামলায় (সম্ভবতঃ গাজী গোলাম মোস্তফার আনীত রীট ছিল সেটা) গভর্ণরের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলে সেদিনই সন্ধ্যায় গভর্ণর আমাকে তাঁর সংগে

www.pathagar.com

চা পানের দাওয়াত করেন ফোনে। লাট সাহেবের দাওয়াত রক্ষার জন্য যথারীতি লাট ভবনে উপস্থিত হই। আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি মামলাটির প্রসংগ উত্থাপন করে বললেনঃ জজ সাহেব, আপনার আদালতে আমি কেবল হেরেই যাই। জবাবে বললামঃ লাট সাহেব, আপনার এই কথায় কি আমি ধরে নেবো যে, পরবর্তী মামলাগুলোতে আপনাকে জিতিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে পরোক্ষভাবে প্রস্তাব করছেন?

প্রশ্নটা শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "জজ সাহেব, আমাকে ভুল বুঝবেন না। তেমন বেআইনী প্রস্তাব আমি কখনো করতে পারি না। আপনার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আর বিশ্বাস আছে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একজন বিচারপতি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আপনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি। দেশের সকল আদালতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। আমার শাসনামলে এই প্রদেশে যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সেটাই হবে আমার জন্য গৌরবের এবং অহংকারের।"

সেদিন সেই মুহূর্তে তাঁর কথাগুলোকে তেমন আমল দেইনি। কিন্তু আজ সময়ের বিবর্তনে, বহু অন্যায় আর অবিচার দেখে গভর্ণরের সেদিনের কথাগুলোকে আজ একজন মণিষীর বাণী বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ স্যার, প্রসংগক্রমে একটা প্রশ্ন করতে চাই। জেনারেল টিক্কাখানকে গভর্ণর হিসাবে শপথ না দেয়ার জন্য সেদিন কি কেউ আপনাকে অনুরোধ করেছিল?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ না। কেউ আমাকে তখন অনুরোধ করেননি। জেনারেল টিক্কাখানকে গভর্ণর হিসাবে শপথ না দেয়ার সিদ্ধান্তটি একান্তই আমার বিবেচনা প্রসূত। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রবল চাপ ও বারংবার অনুরোধের পরও আমি সিদ্ধান্ত পাল্টাইনি। ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কবে অবসর গ্রহণ করেছেন?

বিচারপতি এ.বি. সিদ্দিকী ঃ ১৯৭২ সালে জনাব শেখ মুজিবর রহমান আমাকে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। তাই অবসর নেয়ার সুযোগ পাইনি।

মূল্যবান সময় দেবার জন্য আবারও আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

একটি রক্তপাতহীন বিজয়

মোঃ আয়েন উদ্দীন

[জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন একজন আইনজীবি, লেখক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সংসদের সদস্য এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।]

রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর মতাদর্শের নানা বিভেদ নীতিতে বিভক্ত আমেরিকাবাসীকে আমেরিকার জাতির বিবেক বলে বিবেচিত ওয়াল্ডো ইমারসন বলেছিলেন– "যা হবার হয়ে গেছে, এখন তোমরা সকলে ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে একতার বন্ধনে জাতিকে গড়ে তোল"। একই সাথে তিনি আরও বলেছিলেন "তাঁকে বুঝতে যদি পশ্চাশ বছর সময়ও লাগে তবে তিনি বিস্মিত হবেন না"। ওয়াল্ডো ইমারসনকে বুঝতে সত্যিই আমেরিকাবাসীর পঞ্চাশ বছর সময়ই লেগেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নানা মতে বিভক্ত বাংলাদেশীরা আজও ব্যাপকভাবে বিভক্ত।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যা ঘটে গেছে তা আজও আমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারিনি। এবং পারিনি বলেই জাতি আজও একতার বন্ধনে গড়ে উঠেনি। বলাই বাহুল্য, জাতির এই অনৈক্যের ফলেই বাংলাদেশে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সেই সঙ্গে উন্নত হয়নি বিশেষ গোষ্ঠির মন ও মানসিকতা এবং চিন্তা ও চেতনা। তাই স্বাধীনতার দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও একদল আর একদলকে নির্বিচারে একাত্তরের দালাল, স্বাধীনতার শত্রু এবং একদল আর একদলকে ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধাবোধ করছে না। রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের ইতিহাসের আলোকে যথার্থ মুল্যায়ন না করার মানসিকতা জাতির জন্য শুধু হতাশাব্যাঞ্জকই নয় দুর্ভাগ্যজনকও বটে। এই মানসিকতাকে অবলম্বন করেই অনেকে যথার্থ মূল্যায়ন না করে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের বিরুদ্ধে অহেতুক ও অসত্য অভিযোগ করে চলেছে এবং তাঁকে এই অঞ্চলের স্বার্থের পরিপন্থী শক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। এই পরিকল্পিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়নি বলেই আজকের প্রজন্মের কাছে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান বিতর্কিত হয়ে আছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান যেদিন আততায়ীর গুলীতে

www.pathagar.com

শাহাদাৎ বরণ করেন, সেদিন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন না, এমনকি তাঁর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগও না। ১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ থেকেই পাকিস্তানের ক্ষমতায় ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। কিন্তু এদেশের বিশেষ একটি গোষ্ঠি দীর্ঘদিন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান এবং মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। সময়ের ব্যবধানে আজ এই অপপ্রচার মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে। "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত এবং মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য"– আল কোরআনের এই বাণী সত্যে পরিণত হবেই।

জনাব আবদুল মোনয়েম খান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন আপোষহীন এবং সাহসী। একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই তাঁর অনমনীয় ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। বৃটিশ আমলে ময়মনসিংহ জিলা ছিলো হিন্দু প্রতাপশালী রাজা মহারাজদের নিয়ন্ত্রণে। অধিকাংশ মুসলমানই ছিলো তাদের প্রজা এবং সেই সুবাদে তারা ছিলো নির্যাতিত ও নিপীড়িত। হিন্দু রাজাদের অত্যচারের বিরুদ্ধে জনাব আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন প্রতিবাদী। সেই সময় ময়মনসিং শহরে ঈদুল আযহার সময় মুসলমানদের জন্য কোরবানী করা ছিলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হিন্দু রাজাদের ভয়ে এই নির্দেশ কেউ লঘন করতো না। কিন্তু জনাব আবদুল মোনয়েম খান প্রতাপশালী হিন্দু রাজাদের সকল প্রতিরোধ ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মুসলমানদের সংগঠিত করেন এবং ঈদুল আযহার দিনে তিনি প্রথম গরু কোরবানী করেন। ঘটনাটি আজকের আলোকে হয়তো ঘটনাই নয় কিন্তু সেদিনের সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থায় তা ছিলো একটি দুঃসাহসিক উদ্যোগ। আর এই ঘটনাটিই জনাব আবদুল মোনয়েম খানকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জিলার নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমানদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। গভর্ণর হিসাবে জনাব আবদুল মোনয়েম খানের সময়কাল ছিলো ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের ২১ শে মার্চ পর্যন্ত। এই সাত বছরের মধ্যে তিনি এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার যে বিস্ময়কর উন্নতি করেছেন তার বিবরণ এই ছোট্ট পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। তবে সহজ করে এটুকু বললে অত্যুক্তি হবে না যে তিনিই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিদয়াদীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে গেছেন যার সোনালী ফসল আজ বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করছেন।

তাঁর আমলেই শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্প খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। তাঁর শাসনামলেই ৭২টি জুট মিল, ৫৬টি টেক্সটাইল মিল, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮টি মেডিকেল কলেজ, ৫টি ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম স্টীল মিল, ১২টি চিনির কলসহ অসংখ্য কালকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসাবে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান তিনিই শুরু করেছিলেন

www.pathagar.com

এ অঞ্চলের সাংবাৎসরিক খাদ্য ঘাটতি পূরনের জন্য এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ এবং সাত টাকা মণ দরে কৃষকদের সার সরবরাহ করেছেন। একমাত্র কৃষি উপকরণের উপরই তিনি ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর আমলে অন্য কোন উৎপাদন খাতে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো না। বাংলাদেশের সবকয়টি রাষ্ট্রয়াত্ত কলকারখানায় প্রতি বৎসর হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করলেও কৃষি উপকরণের উপর কোন ভর্তুকির ব্যবস্থা করেনি। বাংলাদেশের সরকারগুলো যদি গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের কৃষিনীতি অনুসরণ করে কৃষি পণ্যের ও উপকরণের উপর ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখতো তাহলে এদেশের কৃষককুল এমনভাবে সর্বস্বান্ত হতো না। বাংলাদেশ শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো না, উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানী করে হাজারো কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতো। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের সেবাদাস বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানের সরকারগুলি জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত। তাই আজকের দিনে মোনয়েম খানের মত সৎ ও চরিত্রবান নেতার খুব বেশী প্রয়োজন কৃষককুলের স্বার্থে, দেশের কল্যাণে।

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান এবং ঈমান ও আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন ও অনমনীয়। শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে আমি একটি ঘটনা তুলে ধরছি ঃ

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান থেকে একটি প্রতিনিধি দল সরকারী পর্যায়ে চীন সফরে গিয়েছিলো। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এম.পি.এ) হিসাবে উক্ত প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসাবে চীন সফরের সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এই সফরের সময়ই গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের অনমনীয় চরিত্রের সংগে পরিচিত হই। আমরা যখন সফরে যাই তখন মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছিলো। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় গোটা চীনে সকল মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয় বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা ছিলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আমরা চীনে পৌঁছার পর প্রথম শুক্রবারের সকালে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান জুম্মার নামাজ আদায় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন চীনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ। প্রতিনিধি দলের নেতা গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের পিকিং এ জুম্মার নামাজ আদায় করা অসম্ভব জানিয়ে রাষ্ট্রদূত জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, "চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে। মসজিদসহ সকল উপসনালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং কুটনৈতিক স্বার্থেই মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করার অভিপ্রায় বাতিল

www.pathagar.com

করতে হবে। তাছাড়া আমরা একটি সফরে রয়েছি বিধায় জুম্মার নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।"

রাষ্ট্রদূতের কথা শুনে গভর্ণর সাহেব হাসলেন। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেনঃ "ভাই সুলতান, চীনে কি চলছে তা আমার দেখার বিষয় নয়। আমার কাছে বড় কথা হলো জুম্মার নামাজ আদায় করা। জুম্মার নামাজও আমার জীবন বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আর এই বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখার জন্য আমি মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে চাই। প্রতিনিধি দলে আমরা ১৪ জন মুসলমান আছি। আমাদের জন্য চীন সরকারকে একটি মসজিদের দরোজা খুলে দিতে হবে। চীন সরকার যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হয় তাহলে সফর বাতিল করে পরবর্তী ফ্লাইটে দেশে ফিরে যাবো।"

এই বক্তব্যের পর রাষ্ট্রদূত কোন কথা বলেননি। তিনি গভর্ণর সাহেবের কথাগুলো চীনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে চীন সরকার তাদের সরকারী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পিকিংয়ের একটি মসজিদ খুলে দেয় জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্য।

প্রতিনিধি দলের বাইরেও দূতাবাসের প্রায় বিশজন মুসলমান নিয়ে আমরা পিকিং মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেছি। সবচেয়ে আনন্দ আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় গোটা চীনে সেদিনই একজন চীনা মুয়াজ্জিন মসজিদে জুম্মার নামাজের আযান দিলেন এবং নামাজের ইমামতী করলেন একজন চীনা ইমাম সাহেব।

চীনা মুয়াজ্জিন যখন আযান দিচ্ছিলেন তখন মনে হয়েছিলো যেন নিজের জন্মভূমিতে বসে আযান শুনছি। অভিন্ন ভাষায়-অভিন্ন সুরের আযান। ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধর্ম, ভৌগলিক সীমানার উর্ধে আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা তা আরেকবার নতুন করে উপলব্ধি করেছি চীনের মাটিতে বসে।

আমার জীবনে এটি একটি অবিস্মরনীয় স্মৃতি। একজন মুসলমানের দৃঢ় ঈমানের কাছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশের সরকারকে নত হবার ঘটনাটি আমার কাছে একটি রক্তপাতহীন বিজয় বলে অনুভূত হয়েছিল তখন।

গভর্ণর আবুদল মোনয়েম খানের রাজনৈতিক জীবনে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিলো না, একথা আমি বলতে চাই না। তবে একজন মানুষ তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বসবাস করে কিভাবে সমস্ত সততা আর আন্তরিকতা নিয়ে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু গোটা দেশে তাঁর অনুপম সৃষ্টিগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। অহেতুক বিষোদগার না করে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানকে আজ যথাযথ মূল্যায়ণ করা উচিৎ তাঁর ত্যাগ, কর্মকান্ড আর অবদানের আলোকে।

www.pathagar.com

দু'টি সংসদ ভবন নির্মানের জন্য তিনি অমলিন গৌরবের অধিকারী

- আতিকুল ইসলাম

১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট ভারত বিভক্তি হয়ে যখন পূর্ব বঙ্গ গঠিত হয় তখন এখানে কোন সংসদ ভবন ছিলো না। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে পূর্ব বঙ্গ থেকে এবং আসাম লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর বৃহত্তর সিলেট জিলা থেকে নির্বাচিত (গন ভোটে সিলেট জিলা পাকিস্তানে অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলো) মোট ১৭১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ইষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী গঠিত হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ব বংগে সংসদ ভবন নির্মান করা তো দুরের কথা ৪৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেয়ার মতো অর্থও পূর্ব বাংলা সরকারের ছিলো না। এমন কি সরকারের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, পেন্সিল, কার্বন পেপার, আলপিন কেনার অর্থও ছিলো না সরকারী কোষাগারে। ভারত ভাগ হবার সময় অনেক কিছুর সাথে পাকিস্তানকে ৮৪ কোটি টাকা দেয়ার কথা ছিল ভারতের। ভাগের সেই অর্থ না পাওয়ার কারনে (ভারত সেই ভাগের টাকা পাকিস্তানকে কোনদিন পরিশোধ করেনি) এই দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছিলো পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহ'র নির্দেশে ভারতের বোম্বে থেকে পূর্ব বংগে হিজরত করা ইস্পাহানী মহোদয় নিজের পকেট থেকে পূর্ব বংগের সরকারী কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন দিয়েছিলেন যা তিনি কখনোই ফেরৎ নেননি। ইস্পাহানী মহোদয়ের সেদিনের মহানুভবতার ঋন আমরা পরিশোধ করেছি ১৯৭২ সালে তার প্রতিষ্ঠিত সকল শিল্প কারখানা রাষ্ট্রয়াত্ব করে। সত্যি কি অপূর্ব প্রতিদান।

২৯ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে ইষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশ শুরু হয়। এ্যাসেম্বলীর প্রথম স্পীকার জনাব আবদুল করিম এবং ডেপুটি স্পীকার জনাব নাজমুল হক।

সংসদ ভবন না থাকায় জগন্নাথ হলের সমতল মিলনায়তনে অধিবেশনের সময় চেয়ার ও বেঞ্চ বসানো হতো সদস্যদের জন্য। স্পীকারের জন্য তৈরী করা

www.pathagar.com

হতো অস্থায়ী মঞ্চ। অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর চেয়ার টেবিল ও স্পীকার মঞ্চ সরিয়ে ফেলা হতো হলের ছাত্রদের মিলনায়তন ব্যবহারে সুবিধার জন্য। অধিবেশন চলাকালে সংসদকে একটি ক্লাস রুম বলে মতো। এভাবেই সংসদ অধিবেশন চলেছে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত।

২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন দল। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থকগন মুসলিম লীগ নেতাদের মর্যাদাবোধ ও সততা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং বিশ্বাসী ছিলেন বলেই আজকের মতো তত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয়নি। ১৯৫৪ সালের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত ইষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থেকে ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসলে জয়ী হয়ে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক সততা, ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ এবং জনগনের প্রদত্ত রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আর কোন দলই স্থাপন করতে পারবেনা বলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমরা চালু করেছি। এ আমাদের জন্য আজ লজ্জার। ক্ষমতালোভী অসৎ ও মর্যাদাহীন রাজনীতিবিদদের জন্য গোটা জাতিকে এ লজ্জা বহন করতে হচ্ছে। পৃথিবীর কোন দেশেই অসৎ ব্যক্তিরা বা রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের মতো জাতীয় রাজনীতি করার সুযোগ পায়না। সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভ করেনা। ফলে নির্বাচনে কারচুপি বা ভোট ডাকাতির আশাংকাও কেউ করেনা।

৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব বংগের মূখ্যমন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত সংসদীয় সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জনাব আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। জনাব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব শেখ মুজিবর রহমান শিল্প ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির সমন্বয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছিলো। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানে যুগপৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময়ও পূর্ব পাকিস্তানে সংসদ ভবন নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেনি। ফলে জগন্নাথ হলের মিলনায়তনেই অধিবেশন হতো। ১৯৫৭ সালে জগন্নাথ হলের

www.pathagar.com

অধিবেশনেই সাংসদদের হাতে স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার যে গনতন্ত্র শাহেদ আলীর হত্যার মাধ্যমে চালু হয়েছিলো তা আজো চলছে অব্যাহতভাবে।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত স্পীকার শাহেদ আলীর জন্য কোন রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবি শোক প্রকাশ করেনি। হত্যা কান্ডের সংগে সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিচারের দাবী করেনি কেউ। ফলে শাহেদ আলী পাটোয়ারীর পরিবার-পরিজন এই হত্যাকান্ডের বিচার পায়নি আজ পর্যন্ত। প্রতিপক্ষের বা পুলিশের লাঠির আঘাতে অখ্যাত কোন দলীয় কর্মী আহত হলে আমরা ঘটনার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবীতে যেখানে হরতাল করি, সরকারের পতন ঘটাই সেখানে সংসদ চলাকালীন সময়ে সংসদ কক্ষে সাংসদদের হাতে স্পীকার নিহত হবার পরও আমরা ঘটনার প্রতিবাদ করিনি। বিচার দাবী করিনি কারন ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট নেতাদের হাতেই স্পীকার নিহত হয়েছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকান্ডটি এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। রাজনীতির নামে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্ধ সমর্থন ও আনুগত্য যে আমাদের বিবেককে গলা টিপে হত্যা করছে, স্পীকার শাহেদ আলীর হত্যাকান্ডের বিচার না হওয়ার ঘটনাটি সেই সত্যকে আজো নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। আমার অপছন্দের মানুষের হত্যাকারীকে ফাঁসিতে ঝুলাতে না পারা পর্যন্ত সহিংস আন্দোলন অব্যাহত রাখি অন্যদিকে আমার পছন্দের মানুষের হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয় পদক দিকে আনন্দ প্রকাশ করি। নৈতিকতার এই অবক্ষয় আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ক্যানসার ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বনাশা পোকায় খেয়েছে আজ আমাদের লালিত বিবেক।

৪. ১৯৫৮ সালের ১৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেরারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করার সময়ও পূর্ব পাকিস্তানে কোন সংসদ ভবন ছিলোনা। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জাতীয় নির্বাচন করা হয়। আবদুল মোনয়েম খান এম.এন.এ নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬২ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। শপথ গ্রহনের পরই তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবন (সংসদ ভবন) নির্মানের উদ্যোগ গ্রহন করে তেজগাঁও এলাকায় মাত্র নব্বই দিনে প্রাদেশিক সংসদ ভবন নির্মান কাজ সমাপ্ত করেন। মাত্র নব্বই দিনের

www.pathagar.com

মধ্যে একটি সয়ংসম্পূর্ন ও পূর্নাংগ সংসদ ভবন নির্মান করার ঘটনাটি আশ্চার্য মনে হতে পারে, তবে বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ১৩ বৎসরে বিভিন্ন সরকার যা নির্মান করার উদ্যোগই নিতে পারেনি সেখানে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান মাত্র নব্বই দিনে সংসদ ভবন নির্মান কাজ অবিশ্বাস্য ভাবেই সম্পন্ন করেছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সব কয়টি সংসদ অধিবেশন তেজগাঁওয়ে নির্মিত সেই সংসদ ভবনে হয়েছে। সেদিনের প্রাদেশিক সংসদ ভবনটি আজ প্রদান মন্ত্রীর কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার প্রধান হিসাবে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খানের আরেকটি চোখ ধাঁধানো কৃতিত্ব হলো শের-এ-বাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ ভবন।

তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খানের সভাপতিত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নাথিয়াগলিতে ১৯৫৯ সালের ১২-১৩ জুন অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক গভর্নদের সম্মেলনে ঢাকায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই লক্ষে ১৯৬১ সালে খেজুর বাগানে (বর্তমানে শের-এ-বাংলা নগর) ২০৮ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক লুই আই কান জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সের প্রধান স্থপতি। তার মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হেনরী এন উইলকেটস কমপ্লেক্সের ডিজাইন সম্পন্ন করেন এবং হেনরী এম পামবাম সংসদ ভবনের ষ্টাকচারাল ডিজাইন করেন। সংসদ ভবনের তিনটি অংশ ঃ

১। জাতীয় সংসদ ভবন ঃ নির্মিত এরিয়া- ১ লাখ ৫০ হাজার বর্গফুট।
প্লিন্থ এরিয়া- ৮ লাখ ২৩ হাজার বর্গফুট।
এতে রয়েছে নয়টি ব্লক। যথাঃ
ক) সংসদ কক্ষ ব্লক। খ) পশ্চিম ব্লক। গ) উত্তর পশ্চিম ব্লক। ঘ) উত্তর ব্লক। ঙ) উত্তর পূর্ব ব্লক। চ) পূর্ব ব্লক। ছ) দক্ষিণ পূর্ব ব্লক জ) দক্ষিণ ব্লক ও ঝ) দক্ষিণ পশ্চিম ব্লক।

২। দক্ষিণ প্লাজা ঃ নির্মিত এরিয়া - ৬৫ হাজার বর্গফুট।
প্লিন্থ এরিয়া - ২ লাখ ২৩ হাজার বর্গফুট।

এতে রয়েছে ঃ নিয়ন্ত্রন গেট, ড্রাইভওয়ে, প্রধান যন্ত্রপাতির কক্ষ, গাড়ী রাখার জায়গা, টেলিফোন অক্সচেঞ্জ, প্রকৌশলীদের অফিস, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৩। প্রেসিডেনশিয়াল স্কয়ার ঃ নির্মিত এরিয়া- ৬৫ হাজার বর্গফুট।
প্লিন্থ এরিয়া - ৬৫ হাজার বর্গফুট।

এতে রয়েছে ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, সংসদ নেতা ও উপ-নেতা, মন্ত্রীবর্গ, বিরোধীদলীয় নেতা ও উপনেতা, চীফ হুইপ ও হুইপগন, সংসদ সচিব ও সংসদ সচিবালয়ের অফিস। এছাড়া তিন পার্টির জন্য তিনটি নিজস্ব কক্ষ, ব্যাংক, ডাকঘর, নামাজঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ডাইনিং হল, ক্যাফেটোরিয়া গ্রন্থাগার এর আলাদা ব্যবস্থা ও কক্ষ।

সমগ্র সংসদ ভবনটি কেন্দ্রীয় ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভবনে মোট ২৪টি লিফট কাজ করছে। সংসদ কক্ষের উচ্চতা ১১২ ফুট আর সংসদ ভবনের উচ্চতা ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। সিড়ি রয়েছে ৫০টি, টয়লেট ৩৪০টি, দরজা ১৬৩৫টি। গোটা ভবনটি কংক্রিট ঢালাইয়ের নির্মিত।

সংসদ কক্ষে সাংসদদের জন্য আসন রয়েছে ৩৫৪টি। ভি,আই,পি গ্যালারীর আসন ৫৬টি, সাংবাদিকদের আসন ৮০টি, কর্মকর্তার আসন ৪১ টি ও সাধারন দর্শকদের আসন ৩৪০টি।

জাতীয় সংসদ ভবনের রক্ষনাবেক্ষন ও অপারেশন খরচ বৎসরে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এক এলাহী ব্যাপার নিঃসন্দেহে অথচ ১৯৬৪ সালে সংসদ ভবন নির্মানের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিলো মাত্র ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

৬. বিশ্বের এই বিস্ময়কর ও শ্রেষ্ঠতম সংসদ ভবনটির নির্মান শুরু হয়েছিলো ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার প্রধান গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান এর শাসনামলে। ২১৫ একর জমির উপর জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স নির্মিত। এর মধ্যে মূল সংসদ ভবন, সংসদ সদস্যদের জন্য হোষ্টেল, আবাসিক ব্যবস্থা, ক্রিসেন্টলেক, বাগান ও রাস্তা রয়েছে। আবদুল মোনয়েম খানের শাসনামলে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সংসদ ভবনের শতকরা ৮০ ভাগ নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ নির্মান কাজ সম্পন্ন করে সংসদ অধিবেশন বসতে সময় লেগেছিলো ২০ বছর। ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা যে সংসদ ভবনটির জন্য ব্যয় বরাদ্ধ ছিলো ১৯৮২ সালে সেই ব্যয় গিয়ে দাড়ায় ১২৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ শাসনামলে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খান দু'দুটি সংসদ ভবন নির্মান করে গেছেন অথচ আজ আমরা সেই সত্য প্রকাশ করতে কষ্টবোধ করি। ক্ষুদ্র মানসিকতা আর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারনে আমরা মহান মানুষদের অবদান অবলীলায় অস্বীকার করে নিজেদের দৈন্যতাকেই প্রকাশ করে যাচ্ছি। এদেশে গভর্নর আবদুল মোনয়েম খানের বহু বিস্ময়কর ও নান্দনিক সৃষ্টির মধ্যে/ দুটি সংসদ ভবন অন্যতম যা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর গৌরব গাঁথা ঘোষণা করতে থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত, যেমন আজো ঘোষনা করছে দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, কুতুব মিনার, আগ্রার তাজহল এর নির্মাতাদের গৌরবগাঁথা।

ইতিহাসে স্থাপনার চেয়ে নির্মাতাই অধিকতর গৌরবান্বিত।

(লেখক- মহাসচিব, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ)

www.pathagar.com

আমার আব্বা

শিরিণ মোনয়েম খান

'আব্বা' ডাকটা এত দুর্লভ হতে পারে, আগে কোনদিন বুঝিনি। আর আমার রক্তের বিনিময়েই তা বুঝতে হবে, তাও কোনদিন ভাবিনি।

ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি আব্বা আমাদের জন্যে খুব দূর্লভ। আম্মা বলতেন, পলিটিক্স করলে এমনিই হয়। বিশেষ করে ১৯৬২ সালের অক্টোবর থেকে আব্বা আমাদের কেউ নন এমনটি হয়ে গেলেন। তিনি গভর্ণর ভবনে জনগণের খাদেম, আর কারো কিছু নন, আমাদের যেন এইই ভাবতে শিখাচ্ছিলেন। পার্থক্য শুধু – জনগণের হয়েও আমরা ছিলাম তাঁর নিকটতম।

কায়রোর বিমান দুর্ঘটনার বড় ভাইয়ের (আখতার উজ্জামান খান বাচ্চু ভাই) মৃত্যুটা আব্বাকে পরিবারমুখী করবার প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু ফলোদয় হয়নি। পরদিনই তিনি চলে গিয়েছিলেন বরিশাল-সাইক্লোন বিধ্বস্ত এলাকায়। এর কিছুদিন পরই শুরু হয়েছিল পাক-ভারত যুদ্ধ। কাসুর-খেমকারানের রণাঙ্গন সফর করে পুত্র হারানোর বেদনা ভুলতে আব্বা তখন ব্যস্ত। আমরা আম্মাকে ঘিরে বাঁচবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। ঠিক এর পরের বৎসরই যখন আল্লাহ আম্মাকেও নিয়ে গেলেন, আব্বা তখনও সুস্থিরে আমাদের সান্তনা দেননি। কিছুদিনের মধ্যে বন্যা দেখা দিল জেলায় জেলায়– আব্বা আবারও জনগণের মাঝে হারিয়ে গেলেন। আমার মনে আছে, আব্বার চোখের পানি তখনো শুকায়নি। সিলেট সফরে গেলেন বন্যার্তদের খেদমতে। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি আমাদের পাশে বসলেন, যেন আমরা অপরাধ না নিই। আজ ভাবি, অপরাধের কি ছিল? বাংলার বন্যার পানিতে আব্বার রক্ত মিশে যাক একান্তভাবেই তিনি তা চাইতেন। আল্লাহর বিধানে তাই হল।

রিলিফ কাজে গিয়ে দু'বার আব্বাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। একবার হেলিকপ্টার ল্যাণ্ডিং-এ সময় আর একবার চাটগাঁর সড়কে। আব্বা ফিরে এলে আমরা তাকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম। আশ্চর্য, আমাদের আবেগটা তাঁর কাছে ঘরোয়া মূল্য পেল না। দৃঢ় সুরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর মোমেন বান্দা মৃত্যুর জন্যে সদাই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আমরা জানতাম, আব্বা নিজের জন্যে হামেশা তৈরী থাকলেও বড় ভাই আর আম্মার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। গভর্ণর ভবনে সরকারী ফাইল দেখতে দেখতে তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত যখন হয়ে আসত দু'একটি হাই তুলে আব্বা সাহারার দিগন্তে হারানো পুত্রের কথা ভেবে মুহূর্তের জন্যেও মুষড়ে পড়তেন না তা অস্বীকার করবার তাঁর জো ছিল না। খুব সম্ভব

www.pathagar.com

আম্মার কথা স্মরণ হলে আব্বার মনটা যখন ব্যস্ত হয়ে উঠত তখনই আমাদের কাছে ডেকে নিতেন আর বলতেন আদব কায়দার কথা, আল্লাহর পছন্দ অপছন্দের কথা– যা এক সময় আম্মারই বলবার ছিল। আজ ভাবতেও মনে কষ্ট জাগে আব্বা এক এক সময় আমাদের আম্মা হতে চাইতেন। স্কুলে পরীক্ষা দিতে যেদিন কেবল আব্বাকে সালাম করে আমাদেরকে রওনা হতে হচ্ছিল, সেদিন আম্মার হয়ে আব্বা বলছিলেনঃ 'বিসমিল্লাহ বলে খাতাটা হাতে নিবে, বিসমিল্লাহ বলে লেখাটা শুরু করবে।'

একদিন খেতে এসে আব্বা আমাদের বললেন, নাটোরা ঘুরে এলাম। আমরা এর মর্ম বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। আব্বা তখন উদাস স্বরে বললেন, এমন একদিন ছিল মুসলমানেরা নাটোর মহারাজের বাড়ীতে জুতা পায়ে ঢুকতে পারতেন না। আব্বা বলে চললেন, ছাত্রজীবনে একবার রিলিফের কাজে আমরা নাটোর গিয়েছিলাম। আমি জেদ করেছিলাম, জুতা খুলে অন্দরে যাব না। সঙ্গীরা আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়েছিল। তবু আমি জুতা খুলিনি। আর আজ আল্লাহর দয়ায় ওটাকেই আমি গভর্ণর হাউস করে এলাম। তারপর এক রকম একাকিই কোরানের আয়াত পড়লেন– আল্লাহই রাজ্য দান করেন, আল্লাহই তা ছিনিয়ে নেন।

দু'জন শিক্ষাবিদের কথা আব্বা আমাদের খুব বলতেন। একজন হলেন স্যর আহম্মেদ ফজলুর রহমান। অপর জন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আব্বা দু'জনেরই একান্ত ভক্ত ছাত্র ছিলেন। স্যার এ, এফ রহমানের শৃঙ্খলাবোধ আর ন্যায়নিষ্ঠা আব্বাকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ধর্ম-প্রীতি ছাত্রজীবনেই আব্বার চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল। এ যুগের এই আলবেরুনী, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়, আব্বা তখন খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বলতেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রমাণ।

দুটো প্রতিষ্ঠানের অতীত নিয়ে আব্বা আমাদের অনেক গল্প শুনিয়েছেন। একটি হল মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব। অপরটি হল দৈনিক আজাদ। আব্বা বলতেন, মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব আমাদের দিত মুসলমানী তেজ আর দৈনিক আজাদ যোগাত ইসলামী জোশ। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ দুটো প্রতিষ্ঠান ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলন এত শীঘ্র সফল হতো না। আমরা ভাইবোনেরা ইনডোর গেমে বসলে আব্বা প্রায়ই এ প্রসঙ্গ টানতেন। তিনি খেলাধূলায় কিন্তু বেশ উৎসাহী ছিলেন। আমরা লুডো নিয়ে বসলে আব্বা বলতেন, এটা তো চান্সের খেলা। কেরাম কি দাবা যেটাতে মাথা ঘামাতে হয় তা নিয়ে বস না কেন? আবার শীত এলেই আউট ডোর গেমে তার আগ্রহ বেড়ে যেত। ব্যাডমিন্টনের আয়োজনে আমাদের চেয়ে

www.pathagar.com

আব্বাই আগুয়ান থাকতেন বেশী। পারিবারিক পিকনিকে আমরা যখন লাইট মুডে থাকতাম তখনই আব্বা সুকৌশলে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন, রসুলুল্লাহর সংসার জীবনে আনন্দ আসলেও তাতে সৌন্দর্য বজায় থাকত।

১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে আমরা আব্বাকে খুব কাছে পেতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, বদ্ধ পরিবেশ থেকে আব্বা মুক্ত জীবনে ফিরে এলেন। কিন্তু সময় ও পরিবেশের বদলে আব্বার মানসিকতার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। তাঁর কোন অনুতাপ ছিল না, কোন ভীতি ছিল না।– শারীরিক মানসিক সবটা স্বাস্থ্যই ভাল ছিল। আল্লাহর মর্জীকেই যিনি চূড়ান্ত মনে করতেন, একমাত্র তাঁরই বোধহয় এমনটি হওয়া সম্ভব। আব্বা বলতেনঃ কোন অনুতাপ নেই, কারণ আমি আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করেছি; কোন ভীতি নেই, কারণ আমি কখনো অসাধুতার কিছু করিনি। আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট ইজ্জত দিয়েছেন, এবার শুধু ঈমান নিয়ে তাঁর দরবারে যেতে পারলেই বাঁচি। আমার নিয়ত তিনিই ভাল জানেন। তিনিই সঠিক বিচার করবেন।

বনানীর নির্লিপ্ত দুটো বৎসর আমাদের জন্যে খুব সুন্দর ছিল। আমরা আব্বাকে কতো করে ডাকতে পারতাম, কত নিবিড় ভাবে তাঁকে পেতাম। মনে হতো, গভর্ণর হাউসে প্রায় সাত-সাতটি বছর আব্বা কতো দূরেই না ছিলেন। আব্বাও আমাদের খুব ডাকতেন। ছোট থেকে বড় কত আলাপ করতেন। প্রসঙ্গ পেলেই আম্মার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতেন ঃ শিক্ষিত হও কিন্তু অহঙ্কারী হয়ো না; স্মার্ট হও, তবে বেয়াদব হয়ো না। খুব সম্ভব এজন্যেই ইসলামী এলেম ও আমলের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়াতে আব্বা সবসময় সচেষ্ট থাকতেন। আমরা ইংরেজী স্কুলে পড়লেও বাংলা ভাষা ও কালচারকে যেন ভাল করে জানি তার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন। আব্বার গম্ভীর শাসনে যাতে আমরা জড়তা ও আড়ষ্টতায় না ভুগি সেজন্য পারিবারিক উৎসবগুলোতে তিনি আমাদের সাথে একেবারে মিশে যেতেন। ঈদের দিনগুলোর কথা আমার খুব মনে পড়ে। ঈদের রাতে টুকটাক কাজেও তিনি তুক্‌তুক্‌ করে শরীক হতেন।

প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়ে আব্বা যখন মুনাজাতে থাকতেন, আমার ঘুম তখন ভেঙ্গে যেতো। শুয়ে শুয়ে শুনতাম আব্বার মুনাজাত। প্রায়ই তিনি ফারসী বয়াতে মুনাজাত সারতেন। তা হয়তো বা হতো মওলানা রুমী, শেখ সাদী কিংবা অন্য কারো। তারপর আব্বা তসবীহ হাতে নিতেন। আমার বড়ই আগ্রহ জাগত জিজ্ঞেস করি, আব্বা কি পড়েন– ইয়া সালামু না ইয়া কাহহারু– শান্তি চান না ধ্বংস চান। কোনদিন সে সাহস' আর হয়নি। একে একে আমিই ধরে দিতাম, আব্বা শুনতেন– বেতারে ঢাকার খবর, কোলকাতার খবর বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকার খবর। শেষ ছ'মাসে খবর শুনতেন স্বাধীন বাংলা বেতারেরও।

www.pathagar.com

নিত্যকার সংবাদপত্রগুলোতে আব্বা অনেক্ষণ ডুবে থাকতেন। কোন কোন সময় বলতেন, নাও এই আর্টিক্‌ল্‌টা পড়। দিনরাতের যে কোন সময় আব্বা কোরআন শরীফ নিয়ে বসে পড়তেন। পাশেই রাখতেন মওলানা ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদ খানা। পারিবারিক জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে কোন আয়াতের মিল পড়ে গেলে আমাদের ডাকতেন আর সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন–আল্লাহ কি হুকুম করেছেন। বিশেষ করে প্রসঙ্গগুলো হত দান-খয়রাত, আচার-ব্যবহার আর লেখাপড়ার ব্যাপারে।

মাঝে মাঝে আব্বা আমার সাথে রাজনীতির গল্প জুড়ে দিতেন। আমি তখন খুব অপ্রতিভ হয়ে পড়তাম। কিন্তু আব্বার ভাবটা এমন হত যে আমার মন্তব্যটা তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বরং নানা কথায় প্রসঙ্গটা কাটিয়ে যেতাম। পূর্ব পাকিস্তানের প্রসঙ্গ আসলেই আব্বা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, এটা কাশ্মীর না হলেই হয়। মজাদার এমনি আলাপের মাঝেই হয়ত খবর আসত, কেউ দেখা করতে এসেছেন। আব্বা অমনি উঠে চলে যেতেন। তারপরই আব্বাকে দেখতে পেতাম বাগানে। নিজ হাতে কলা, পেঁপে, পেয়ারা কিংবা অন্য কিছু তুলছেন আর সাক্ষাত প্রার্থীর হাতে দিয়ে বড়াই করছেন– আমাদের যতনেই আল্লাহ এত দিয়েছেন।

ফুল, ফল ও সব্জীর বাগান করা আব্বার আজন্মের সখ। বনানীতে তিনি এ সুখটা খুব মিটিয়েছেন। এর চেয়ে বড় সখ ছিল, বাগানের ফল ও সব্জী পরিচিত-অপরিচিত যে কাউকে দিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া। আমিই মাঝে মাঝে আব্বাকে ভৎসনা করেছি– লোকে কি ভাববে। কিন্তু আব্বা সুযোগ পেলেই এগুলো দিয়ে ফেলতেন। জীবনের শেষ শবে বরাতে আব্বা তাই করেছেন। হালুয়া-রুটি দেয়ার চেয়ে তিনি গরীব-মেসকিনদের সেদিন ফল সমূহই বেশী দিয়েছেন। মাঝে মাঝে দেখতাম, আব্বা ফুল, ফল ও সব্জী চাষের বই পড়ছেন। পড়তে পড়তে আমাদের বলতেন, তোমাদের আম্মা এগুলো খুব পছন্দ করতেন। আমাদেরও তখন মনে পড়ে যেত আম্মা কত খেয়াল রাখতেন, আব্বা কোন পিঠা আর কিসের মোরব্বা বেশী ভালবাসেন। আম্মা, আব্বা একে অপরের প্রতি যে দায়িত্ববোধ দেখতেন তাতে আমাদের অনেক কিছু শিখবার ছিল। প্রায়ই দেখতাম, আব্বা আম্মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর মুনাজাত করছেন। জানিনা, সেই মাটিটা আব্বার খুব ভাল লেগেছিল কি না।

জুম্মার দিনটা আব্বার জন্যে সপ্তাহের নতুন কিছু ছিল। আব্বা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বরাবরই পছন্দ করেছেন। সব সময় গোছানো থেকেও জুমআর দিনে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন। আর আমার জন্যেও সেদিনটা সুখস্মৃতির কারণ হয়ে রয়েছে। মসজিদে নামাজ সেরে ফিরে আসার সময় আব্বা আমার জন্যে কিছু না কিছু

www.pathagar.com

এমনকি তেতুলটাও কিনে নিয়ে আসতে ভুলে যেতেন না। ঘরে-বাইরে আব্বার অনিয়ন্ত্রিত নিঃসঙ্গ চলাফেরায় যখনই আমি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছি তখনই আব্বা আমার স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ হাস্‌বিয়াল্লাহ–আমার জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আমি আব্বার সাথে তর্ক করতাম। আমরা যখন কারো যাতনার কারণ নই তখনো কেন যন্ত্রণার শিকার হয়ে আছি। আব্বা স্মিত হাসিতে বলতেন, ভুলে যেয়ো না মা–আমরা একটি পলিটিক্যাল ফ্যামিলি।

অবশেষে আমাদের জন্যে ১৩ই অক্টোবর এল। বিকেলে আমি যখন কলেজ থেকে চলে আসছিলাম আমার এক বান্ধবী সুন্দর করে বললঃ উইশ ইউ গুড লাক। জীবনে এর চেয়ে বড় 'আয়রণী' আর কি হতে পারে। আহত আব্বাকে দেখতে সন্ধ্যাশেষে যখন হাসপাতালে ছুটছিলাম তখন মনে হচ্ছিল, বেগবান গাড়ীটিও স্তব্ধ হয়ে আছে। তখন আমার চোখে ভাসছিল রক্ত-অনেক রক্ত; আমার নাকে লাগছিল কর্পূরের গন্ধ। এই হাসপাতালে আব্বা কতবারই না 'সারপ্রাইজ ভিজিট করেছেন। তখন তিনি ছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্যাট্রিয়ট কবিতার প্রথম পরিচ্ছেদের নায়ক। আর আজও তিনি সারপ্রাইজ ভিজিটে এলেন। পার্থক্য শুধু পরিচ্ছেদে। এবার তিনি শেষাংশের প্যাট্রিয়ট। পার্থক্য আর একটি ক্ষেত্রেও ছিল। গভর্ণর হাউসে আব্বা তো দূরের কথা আমাদের অসুখ-বিসুখ হলেও এক রকম বিনা রিকুয়েষ্টে নামজাদা ডাক্তারদের কিউ হয়ে যেত–প্রতিযোগিতা লেগে যেত কে আব্বার নজরে পড়বেন। ১৪ই অক্টোবরের রাতটা শেষবারের মত প্রমাণ করল, সেদিনের ডাক্তারীতে রোগীর চেয়ে নিষ্প্রাণ ইমারতটাই বড় ছিল। আব্বা আমাকে ডেকে নিয়ে যখন আল্লাহর কাছে সপে দিচ্ছিলেন, আমি তখন তাঁর কপালে চুম্বন দিলাম। বোধ হল, ঠান্ডা। শেষ রাতে আব্বার গোটা শরীরটাই শীতল হয়ে গিয়েছিল। সকালে–যে সময়টায় আব্বা প্রায়ই আম্মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন সেইক্ষনে তাঁকে বনানী নিয়ে আসা হল। কিন্তু 'হোম দে ব্রট হার ওয়ারিয়র ডেড্।'

পরদিন খবরের কাগজগুলোর পাতা যখন উল্টিয়ে যাচ্ছিলাম অনেক কারণেই আব্বার একটি কথা আমার কানে বাজছিল ঃ ভুলে যেয়ো না মা আমরা একটি পলিটিক্যাল ফ্যামিলি।

নির্মম হলেও আজ আমার জন্যে কত সত্য–আর কোনদিন কলেজ ফিরে দেখতে পাবনা আব্বাকে, দেখতে পাবনা জুমআ ফেরত আব্বার বাড়ানো হাতটি। কিন্তু আজো বুকটা আমার সহসা কেঁপে উঠে, এই বুঝি আব্বা ডাকলেন, বেতার-খবর শুনার সময় কেটে গেল বুঝি।

www.pathagar.com

'দুর্নীতি তাঁকে কখনো স্পর্শ করে নি'

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

[ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন।]

আমি রাজনীতিক নই; রাজনীতির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোন সংশ্রবও নেই। তবু কেন তাঁর সম্বন্ধে লেখা দিতে রাজী হয়েছি তা বলা দরকার।

এ কথাও বলা প্রয়োজন যে আবদুল মোনয়েম খানের রাজনীতির বা তাঁর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সমর্থকও আমি ছিলাম না। তাঁর অনেক মতামতের সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর নাম উচ্চারণ করা কেন অন্যায় হবে, বা তিনি গভর্ণর হিসাবে যে সমস্ত গঠনমূলক কাজ করে গেছেন তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করাটাও গোনাহ বা পাপ কেন হবে, সেকথা আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে ইতিহাসের শেষ খণ্ডে আমাদেরই এক প্রাক্তন ছাত্র আবদুল মুহিত লিখেছেন যে, তিনি যখন নিউইয়র্কে বসে মোনয়েম খানের হত্যার খবর পান, তখন তিনি হর্ষধ্বনি করে ওঠেন। ডঃ এ, আর মল্লিক নাকি তাঁকে নিরস্ত করেন এই বলে যে কারো মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করতে নেই। কিন্তু তিনিও এই হত্যার নিন্দা করেননি। মনে হয় এরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে মোনয়েম খানের মত ব্যক্তির এটাই উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু তাঁর অপরাধ ছিল কি? মোনয়েম খান ১৯৬৯ সালে গভর্ণর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর যতদিন বেঁচে ছিলেন রাজনীতি অর্থনীতি কোন কিছু সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। শুনেছি তিনি নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে থাকতেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আর্মি অ্যাকশনের পর আর্মির চাপে কয়েকজন রাজনীতিবিদ বিবৃতি প্রকাশ করতে বাধ্য হন। এঁদের মধ্যে মোনয়েম খান ছিলেন না। তিনি আর্মির পক্ষে কোন কথাই বলেননি। যুদ্ধের ন'মাসের মধ্যে একবারও মুখ খোলেননি। সুতরাং বোঝা যায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সঙ্গে ১৯৭১ সালে ঘটিত ঘটনাবলীর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। একথা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে তিনি ৭১ সালের গৃহযুদ্ধে কোন অংশ নিয়েছেন, কোন হত্যাকান্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বা আর্মি অ্যাকশন সম্বন্ধে যেমন তিনি মুখ খোলেননি তেমনই মুক্তিযুদ্ধের নামে দেশে যে বর্বরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তাঁর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটেছে।

তবু আবদুল মুহিতের মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেন তাঁর মৃত্যুতে হর্ষধ্বনি করেছিলেন? বস্তুত যখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে যোগদান করেন তখন থেকেই মোনয়েম খানের বিরুদ্ধে এমন এক অভিযান আরম্ভ হয় যার ফলে অগনিত তরুণ তরুণী যারা রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানে না, যারা দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ তাদেরও ধারণা হয়েছে যে মোনয়েম খান এমন এক জঘন্য ব্যক্তি ছিলেন যাকে স্মরণ করাও বোধ হয় পাপ।

তিনি প্রথম যখন গভর্ণরের পদ গ্রহণ করেন তখন আমি নিজে এই মোনয়েম খান বিরোধী প্রচারণার শিকার হয়েছিলাম। পাকিস্তান বিরোধী একদল ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের মুখে শুনতাম যে মোনয়েম খান অশিক্ষিত- গোঁয়ার। গভর্ণর হিসাবে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হওয়ার যোগ্যতা তার মোটেই নেই। তখন জানা ছিল না যে মোনয়েম খান ঢাকা ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারী ছিলেন। স্যার এ. এফ রহমান তখন মুসলিম হলের প্রভোস্ট। এই প্রভোস্টের প্রতি তাঁর অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। সেকথা অনেক পরে তাঁর নিজের মুখে শুনেছি।

কিন্তু প্রথম যখন আমাকে বুঝানো হল যে আইয়ুব খান একজন অশিক্ষিত গোঁয়ারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তখন খুব ক্ষুব্ধ হই এবং এ সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম। বলেছিলাম যে 'চ্যান্সেলর-এর কর্তব্য পালন করার মত যোগ্যতা যে ব্যক্তির নেই তার উপর এরকম দায়িত্ব আরোপ করায় উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।'

মোনয়েম খান সম্বন্ধে একটি রাজনৈতিক দলের অনমনীয় বিরোধিতার কারণে আমাদের মত অনেক ব্যক্তির মনে এই সংশয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

এখন একথা স্পষ্ট যে এই বিরোধিতার হেতু কোন বিশেষ অভিযোগ নয়। সত্যকার হেতু হচ্ছে যে পাকিস্তান এবং ইসলামের ব্যাপারে মোনয়েম খান কোন আপোসে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এক নেতা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন সেই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য মোনয়েম খান সে প্রস্তাবে রাজী হননি এবং ঐ নেতা সেই সঙ্কট মুহূর্তে স্বদেশ পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে অবশ্য ঐ নেতা একটি বিবৃতিতে সই করেছিলেন, কিন্তু সেটা অন্য দলের চাপের মুখে।

এক্ষেত্রে স্বদেশ প্রেমিক কাকে বলব? যুদ্ধকালে আমরা চিরকালই শুনেছি যে মানুষ

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ বিস্মৃত হয়ে বিদেশী দুশমনের মোকাবিলা করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেল তার বিপরীত পরিস্থিতি। আর ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে একদল মোনয়েম খানকে বলছে দেশদ্রোহী এবং যারা সেই ৬৫ সালেও পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে দ্বিধা করেনি তারাই নাকি সত্যিকারের দেশ প্রেমিক।

যে দুঃখজনক অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাংলাদেশের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কারণ দেশের জমি এবং রাজনীতি যতই বদলাক, এটা আমাদেরই দেশ। পূর্ব-পাকিস্তান বললেও যেমন বাংলাদেশ বললেও তেমন।

কিন্তু পূর্ববর্তী কালে যে ঐতিহাসিক কারণে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছি সেটাও তো ঐতিহাসিক সত্য। তখন লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণায় এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে প্রমাণিত করে যে, পাকিস্তানের দাবী তারা সমর্থন করে। আজ বলা হয় যে এরা সবাই নাকি ছিল দেশদ্রোহী। পাকিস্তান আদর্শের সমর্থক লক্ষ লক্ষ লোকের নাম উচ্চারণ করা যাবে না। শুধু মোনয়েম খান নন, তখনকার যুগের বহু নেতা যাঁরা '৭১ সালের আগে ইন্তেকাল করেন তাদেরও ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টা চলেছে।

এই প্রক্রিয়া ৭১ উত্তর বাংলাদেশে নুতন, ভারত বা পাকিস্তানে এরকম কিছু ঘটেনি। করাচীতে যেমন গান্ধী গার্ডেনস এখনও বিদ্যমান তেমনই কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কর্মস্থল বোম্বাই শহরে জিন্নাহ হলের নাম বদলানোর প্রশ্ন ভারতে আজো ওঠেনি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নামে ইসলামাবাদে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। অথচ আমরা ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর পরই জিন্নাহ হলের নাম পালটিয়ে দিলাম, ৭১ সালের যুদ্ধের সময় থেকে ইকবাল হলের নাম ছাত্ররা মুছে ফেলল, এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পর এই পরিবর্তন আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হল। অথচ আল্লামা ইকবাল ১৯৩৮ সালে পাকিস্তানের জন্মের ৯ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। আর কায়েদে আজমের মৃত্যু হয় ১৯৪৮ সালে। এদের দুজনের একজনও ৭১ এর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন।

অনুরূপভাবে দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত আলেম সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খাঁ অপাঙতেয় হয়ে গেছেন। মুসলিম সমাজে সাংবাদিকতায় যার জুড়ি ছিল না। যাঁর মোস্তফা চরিতের সমত্যু কোন বই আরবী বা ইংরেজীতে লিখিত হয় নাই এবং যাঁর মৃত্যু ঘটে–৭১-এর বহু আগে। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ– তিনি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং পাকিস্তান

www.pathagar.com

আন্দোলনে বলিষ্ঠ এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
মৌলবী তমিজুদ্দীন, স্যার আজিজুল হকসহ যাঁরা মুসলিম জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদের কেউ স্মরণ করে না।
এই যে ইতিহাসকে নতুন করে লেখার অপচেষ্টা, ইতিহাসের পাতা থেকে পূর্ববর্তী যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম মুছে ফেলবার অপপ্রয়াস এটা শুরু হয় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর। ফরাসী বিপ্লবের পর এরকমের কিছু ঘটেনি। উনিশ শতাব্দীতে আমেরিকায় যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তখনও ইতিহাস বিকৃত করার দূরভিসন্ধি কারো মস্তিস্কে প্রবেশ করেনি। বরঞ্চ গৃহযুদ্ধের তিক্ততার কারণে মার্কিন জাতির মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল চিরতরে সেটার যাতে অবসান ঘটে সেজন্য যে জেনারেল লী আব্রাহাম লিঙ্কনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তিনিও এখন জাতীয় হিরো হিসাবে চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে জেনারেল লী এবং তার বাহিনী যুদ্ধ করেছিল দাসত্ব প্রথার মত জঘণ্য প্রথার সমর্থনে। আর আকরাম খান, মোনয়েম খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা মুসলিম জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে, স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।
স্পেনে গৃহযুদ্ধ হয় ১৯৩৬-৩৯ সালে। এ যুদ্ধে জয়লাভ করেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তাঁকে হিটলারের সমর্থক ফ্যাসিস্ট বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দল ক্ষমতা হারিয়েছে। কিন্তু রাস্তাঘাট থেকে ফাঙ্কোর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা বর্তমানে ক্ষমতাসীন সোশালিস্টরা করেননি।
কম্যুনিস্ট শাসিত রাশিয়ায় এই ব্যাতিক্রম নজরে পড়ে। স্টালিনের আমলে জারদের নাম তো উচ্চারণ করাই যেত না। কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের যে সমস্ত নেতা ষ্টালিনের রোষে পড়েছিলেন তাঁরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন ট্রটস্কি যিনি লেনিনের সহকর্মী ছিলেন। তাছাড়া ত্রিশের দশকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে স্টালিন তারই সহকর্মী বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে তাঁদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে গর্বাচবের আমলে যখন রাশিয়ার নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে স্টালিনের সমর্থন করা আর বর্বরতাকে সমর্থন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তখন তাঁরা ত্রিশের দশকের সব নেতাদের পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্টালিনের নাম শুনলে এখন নাকি রাশিয়ান জনগণের মনে ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়।
পাকিস্তানের পতনের পর যাঁরা ক্ষমতার অধিকারী হলেন তাঁরা ফ্রান্স বা আমেরিকার পদানুসরণ করলেন না। তাঁরা করলেন স্টালিনের। এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনার কথা বলব। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন ফ্রান্সের পতন ঘটে এবং যখন জেনারেল দ্য গল লন্ডনে পালিয়ে এসে প্রবাসী ফরাসী সরকার গঠন

www.pathagar.com

করলেন, তখন নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন মার্শাল পেত্যাঁ। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনিই জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪৫ সালের সংকটের সময় তিনি ভিশি শহরে নতুন সরকার গঠন করে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁকে নাৎসী জার্মানীর দালাল বলা হত। কিন্তু যুদ্ধের শেষে যখন জেনারেল দ্য গল ক্ষমতা দখল করেন, মার্শাল পেত্যাঁর বিরুদ্ধে চরম দেশদ্রোহিতার অভিযোগ থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ড মওকুফ করে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সেটাও শেষ পর্যন্ত শিথিল করা হয়।

পেত্যাঁ মৃত্যু বরণ করেন ১৯৫১ সালের জুন বা জুলাই মাসে। আমি তখন প্যারিসে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখলাম সব ফরাসী খবরের কাগজে বিশেষভাবে তাঁর প্রথম মহাযুদ্ধের কথাই উল্লেখ করা হয়। কারণ তিনি তখন যে দেশপ্রেম দেখিয়েছিলেন পরবর্তী কোন দুস্কর্মের ফলে সে স্মৃতি মুছে যাবার নয়।

আমি এতসব ইতিহাসের উল্লেখ করলাম শুধু এই প্রশ্ন উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে, মোনয়েম খান কি দুষ্কর্ম বা অপকর্ম করে গেছেন যে জন্য তাঁকে স্মরণ করা যাবে না? ইতিহাস থেকে নাম মুছে ফেলবার যে অপচেষ্টার কথা আমি বলেছি, ইংরেজ ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েক তাঁর Nineteen Eighty four নামক উপন্যাসে তার একটি নাম দিয়েছেন। একে বলা হয় কোন ব্যক্তিকে Unperson করা। অর্থাৎ সে ব্যক্তি নেই। কোন কালে ছিল না। তার স্মৃতি বলেও কিছু থাকতে পারে না।

মোনয়েম খান কি সে রকমের একজন Unperson?

তিনি সাত বছর গভর্ণর ছিলেন। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি, সেকথা বলার অর্থ হবে তিনি ফেরেশতা ছিলেন বলে দাবী করা। কিন্তু এ সাত বছরে কোন্ অর্থে দেশ রসাতলে গিয়েছিল যে কারণে তাঁকে মহাপাপী মনে করা হবে?

যাঁরা ৭১ সালের শেষে ক্ষমতা পেলেন তাঁরা দুই বৎসরের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন তাতে কয়েক লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। মোনয়েম খানের আমলে তো কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি।

সোনার বাংলা শ্মশান হল বলে যারা চিৎকার করেছে, এখন তো প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের সব প্রচারণা মিথ্যা। চাউলের দর তখন ছিল সরকারী দোকানে ত্রিশ টাকা মন। বর্তমান আমলে ৫০০ টাকা মণ চাল খাচ্ছি। ২০ টাকার শাড়ী ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায় পরছি। ৭ টাকায় উৎকৃষ্ট লুঙ্গি ২০০ টাকায় পাওয়া কঠিন। একজোড়া জুতা কিনলে লাগে কমপক্ষে সাত আটশ' টাকা। প্ল্যাটিক স্যান্ডেলের দাম হয়ে উঠেছে ২ টাকার জায়গায় ২৫-৩০ টাকা, কাগজের দর উঠেছে দিস্তা

www.pathagar.com

প্রতি আট আনা থেকে ১২ টাকায়।

মোনয়েম খান চাটগাঁ? জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তারই চেষ্টায় দেশে দশটির মত ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একটি হলো– মেয়েদের ক্যাডেট কলেজ। তিনি প্রতি জেলায় একটি করে সরকারী কলেজ স্থাপন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন রংপুর কারমাইকেল কলেজ বা দৌলতপুর কলেজের বেলায় প্রাচীন প্রাইভেট কলেজের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন। এ নীতির সমর্থক আমি ছিলাম না।

কিন্তু একথা কি কেউ অস্বীকার করবেন যে, যে ব্যক্তিকে দেশের শত্রু বলা হচ্ছে তারই চেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটেছিল।

আইয়ুব খানের Works Programme বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পড়েছিল মোনয়েম খানের উপর। দেশের রাস্তাঘাটের উন্নতি তখনই ঘটে। আজ প্রত্যেকটি শহরের সঙ্গে প্রত্যেক শহরের সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। হাইকোর্ট (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট) বিল্ডিংও তাঁর অন্যতম কীর্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসিন হল, জিন্নাহ হল (বর্তমানে সূর্যসেন হল), রোকেয়া হল তাঁর আমলে নির্মিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনিক ভবনও তাঁর আমলেই নির্মিত।

তাহলে তাঁর দুষ্কর্মগুলি কি?

আমি আগেই বলেছি যে, তিনি পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাস করতেন, তিনি ইসলামে বিশ্বাস করতেন। খাঁটি মুসলমান ছিলেন বলতে হবে। শুনেছি বিদেশ ভ্রমণের সময়ও কোন হারাম যেন মুখে না যায় সেদিকে নজর রাখতেন। ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না। ৭১ সালের পর, দেশে যে দুর্নীতির জোয়ার এসেছে, যে জোয়ারে উঁচুনীচ সবাই ভেসে চলেছে সে রকমের দুর্নীতির অভিযোগ তো কেউ আজ পর্যন্ত মোনয়েম খানের বিরুদ্ধে আনতে পারেননি।

এই ব্যাক্তিকে কেন নৃশংসভাবে হত্যা করা হল? তাঁর হত্যার খবর পাই তেহরানে। দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তখন শঙ্কিত হয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। আজকের অরাজকতা এবং অনাচারের মধ্যে তাই মোনয়েম খানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে আমার দ্বিধা নেই। আল্লাহ তাঁকে মাগফেরাত দান করুন।

(১৩-১০-৯৬ইং তারিখে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন উপরোক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন।)

www.pathagar.com

উপাচার্য পদের চ্যালেঞ্জ

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক

[ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক রাজশাহী বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন।]

প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমি ছিলাম এদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর। আজ থেকে প্রায় ২০/২১ বৎসর আগে বাংলাদেশ তখন ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ এবং আমার কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৪ মাইল দূরে, অনেকটা বিচ্ছিন্ন এক পাহাড়ীয়া অঞ্চলে। তখন এদেশ ও দেশের মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান, দৃষ্টিভংগি ও পরিবেশ ছিল আজ থেকে অনেকটা ভিন্ন। সাধারণভাবে পরিচিত পরিবেশে, গতানুগতিক ধারায় চলমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্বের প্রকৃতি, পরিধি ও সমস্যার সাথে অধ্যাপক হিসাবে আমার আগেই পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ছাত্র আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে যেসব সমস্যার সৃষ্টি করত তার ধরন ও তা মোকাবিলার ঝুঁকি সম্বন্ধেও আমার ধারণা ছিল। এ ব্যাপারে অধ্যাপক, ডীন, প্রভোস্ট হিসাবে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাও আমার ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব বহন ছাড়াও ভাইস–চ্যান্সেলর হিসাবে আমার উপর অর্পিত হয় এক অপরিচিত ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশে সাত/আট মাস সময়ের মধ্যে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তার বিকাশের ধারা নিশ্চিত করার এক গুরুদায়িত্ব। এর ফলে, বিশেষ করে সময়ের সংকীর্ণতার জন্য, এমন সব কর্মকাণ্ডের সংগে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে হয় যার সংগে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসাবে আমার পরিচয় থাকার কথা নয়। দালান-কোঠা তৈরী করা, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য জমি একোয়ার করা, শিক্ষক-ছাত্র ছাত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, শহর থেকে যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

আমার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত

www.pathagar.com

ব্যাপারে সমস্যা ছিল বহুবিধ ও অনেক ক্ষেত্রে বেশ জটিল। তবে এ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই আমার সংগে সরকার পক্ষের যে সমঝোতা হয়, সে সমঝোতা পরবর্তীকালে আমার দায়িত্ব পালনের অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যিনি আমাকে হঠাৎ করে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন, তিনি ছিলেন প্রাদেশিক সরকার প্রধান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান। তাঁর সাথে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। তিনিও আমাকে চিনতেন না। ভাইস-চ্যান্সেলর হবার কোন আকাঙ্ক্ষাও আমার ছিল না; আমি তখন বিদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে দুবছরের চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই সাত/আট মাসের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ও জনশূন্য এক পাহাড়ীয়া অঞ্চলে প্রয়োজনীয় দালান কোঠা নির্মাণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি সম্পূর্ণ করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রস্তাব আমি তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাখ্যান করি। তাঁকে একথাও বলি যে, সরকার আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেন না এবং সরকারের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ধরন আমি পছন্দ করিনা। উত্তরে তিনি জানালেন, আমি যে সরকারী অনেক কর্মকাণ্ড বিরোধী সে সম্বন্ধে অনেক রিপোর্ট তাঁর কাছে আছে। তবে অল্প সময়ে ইউনিভার্সিটি গঠন করার মত দক্ষতা নাকি আমার কাছে এ ধারণা তিনি পোষণ করেন।

দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় অনেকটা তাঁর পীড়াপিড়িতে ও অনেক আলোচনার মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপারে তাঁর নমনীয় মনোভাবের জন্য, অলিখিত এক শর্তসাপেক্ষে এ গুরুদায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। এ অলিখিত শর্ত ছিল–বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন পর্যায়ে আমার সংগে সরকারের যদি মত পার্থক্য হয় অথবা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের উপর কোন সময় যদি সরকারী হস্তক্ষেপ করা হয় তা হলে আমার দায়িত্ব পালনে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আজ তাঁর অবর্তমানে একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, তখনকার সরকারী চরিত্র যতই একনায়কসুলভ হোক না কেন, তদানীন্তন চ্যান্সেলর যতই রুক্ষ প্রকৃতির অবাংগালী সুলভ মন-মানসিকতার প্রতীক হয়ে থাকুন না কেন তিনি নিজে এবং সরকারী কোন সংস্থা বা মহল আমার প্রথমে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর এবং পরে ভাইস-চ্যান্সেলর থাকাকালীন অবস্থায় এ অংগীকার ভংগ বা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেননি। আমি কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলেও, বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। মাঝে মাঝে অবশ্য

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে আমার নিকট থেকে রিপোর্ট বা কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে। এসব নির্দেশ বা অনুরোধ প্রায় ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক বলে আমি কার্যকরী করতে অপারগতা জানিয়েছি । আবার কোন কোন নির্দেশ পালন অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনের পরিপন্থী তাও জানিয়েছি। এ নিয়ে সরকার বা চ্যান্সেলর পরবর্তীকালে আর কোন চাপ সৃষ্টি করেননি। একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এটা অক্ষুন্ন ছিল বলেই আমার ধারণা।

কয়েকটি দৃষ্টন্তের উল্লেখ এখানে প্রাসংগিক বলে আমি মনে করি ঃ

(১) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর পদ আমি গ্রহণ করি ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর। যোগদান করার পর দিনই চট্টগ্রাম পৌছি। তারপর শুরু হয় দিন-রাত অবিরাম পরিশ্রম। আমার যাত্রা শুরু হয় বলতে গেলে প্রথমে একজন আর্দালী এবং একজন টাইপিস্ট নিয়ে। একমাস পর প্রকৌশল এবং প্রশাসনিক বিভাগে জনাকয়েক কর্মকর্তা ও কয়েকজন কর্মচারী আমার সংগে যোগ দেন। অর্ডিনেন্স তৈরী করা, মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা, চট্টগ্রাম-হাট হাজারী বড় রাস্তা থেকে বৃষ্টি বাদলের মধ্যে ক্যাম্পাস পর্যন্ত শুধু রাস্তা নির্মাণ, পাহাড়ের গায়ে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, এ ধরনের ছোট খাট দালান কোঠা তৈরী, রাস্তা-দালান কোঠার জন্য জমি একোয়ার করা, বিভিন্ন বিভাগের জন্য শিক্ষক নিয়োগ, সিলেবাস প্রস্তুত, বই-পত্র ক্রয় করে গ্রন্থাকার স্থাপন ইত্যাদি সব কাজ শেষ করা হয় দশমাসের মধ্যে। ১৯৬৬-এর ১ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি অর্ডিনেন্স জারী করা হয়। ঐ দিনই ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয় ১৮ নভেম্বর ১৯৬৬-তে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার তারিখ থেকে মাত্র ১১ মাস সময়ের মধ্যে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি কাজ সমাধানে সরকার ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। সেই সংগে এটাও উল্লেখযোগ্য যে আমার সহকর্মী শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ সবাই আমার সংগে সহযোগিতা করা ছাড়াও আমার মতই দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্বার্থ অনুসন্ধানী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বাধা মাঝে মাঝে আমরা পেয়েছি কিন্তু এসব অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্বের সাহায্যে। রাস্তা তৈরীর সময় এখানে শ্মশান, ওখানে কবরস্থান, এখানে এক আউলিয়ার সমাধি ইত্যাদি কথা তুলে বাধা দেওয়া হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় হয়েছে গ্রামবাসীদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধানে। টি. কে. সম্মানপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ঠিকাদারদের কাজে বিঘ্ন

www.pathagar.com

ঘটাতেন। বিভিন্ন ধরনের কনট্রাক্ট বিজ্ঞপ্তি ছাড়া তাঁকে বা তাঁর লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করতেন। আমি তখনও প্রজেক্ট ডাইরেক্টর। তাঁর আচরণের পূর্ণ বিবরণ জানার পর তাঁকে অফিসে ডেকে সবার সামনে ক্যাম্পাস থেকে তাঁকে বের করে দেই এবং ক্যাম্পাস-এ তাঁর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করি। এর কিছুদিন পর তিনি গভর্ণর এর সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণের কাছে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সভায় ডঃ মীর্জা নুরুল হুদাসহ ৩ জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং আমিও স্থানীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। টি. কে. সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁর মত একজন সম্মানিত স্থানীয় নেতা, একজন আজীবন মুসলিম লীগ সেবক ও সরকার ভক্ত একজন ব্যক্তিকে আমি প্রকাশ্যে ক্যাম্পাস থেকে বের করেছি, অপমানসূচক ও মানহানিকর নির্দেশ দিয়েছি বলে অভিযোগ করে বসলেন। চ্যান্সেলর আমার নিকট থেকে প্রেক্ষাপট শুনে নিয়ে প্রতি উত্তরে তাঁর স্বাভাবিক ধরনের ভাষায় বলেন, আপনি কাজে বাধাপ্রাপ্ত হলে, প্রয়োজন বোধে তাঁকে এবং যে কাউকে ক্যাম্পাস-এ বেঁধে রেখে দিলেও আপনার অপরাধ হবে না কারণ আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজে নিয়োজিত। ঐ সমাবেশে তিনি আরও বলেন যে, এর পরে বাড়াবাড়ি করলে তিনি প্রেসিডেন্টকে দিয়ে ঐ ভদ্রলোকের খেতাব প্রত্যাহার করিয়ে নিবেন। ঐ ভদ্রলোক এর পর আর কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কাজে বাধা দেননি।

(২) আমি তখন প্রজেক্ট ডাইরেক্টর। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বা এ্যাক্ট তখনও গৃহীত হয়নি। সেন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদি তখনও অনুপস্থিত। তখন শিক্ষক এবং উচ্চস্তরের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হত সিলেকসান কমিটির মনোনয়ন এবং চ্যান্সেলরের অনুমোদনের মাধ্যমে। এই ছিল আইন ও প্রচলিত পদ্ধতি। প্রস্তাবিত বাংলা বিভাগের জন্য আমাদের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। তখন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে রীডার হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এই সময়ে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবকে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদ থেকে অপসারণ করা হয় গভর্ণরের নির্দেশে। সিলেকসান কমিটিতে আমরা তাঁকে দরখাস্ত ছাড়াই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই এবং সেই মর্মে চ্যান্সেলরের অনুমোদন চেয়ে পাঠাই। এরপর চ্যান্সেলর মোনয়েম খান চট্টগ্রাম আসেন। সার্কিট হাউস-এ অবস্থানকালে আমাকে ডেকে পাঠান। প্রায় ৫০/৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২ জন মন্ত্রীর সম্মুখে তিনি জানতে চান যে, তিনি যাঁকে বাংলা একাডেমীর

www.pathagar.com

জন্য অযোগ্য বলে অপসারিত করেছেন, আমি তাঁকে বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এবং অনুমোদিত পদ রীডারের জায়গায় অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ কি করে করি? তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, আমার এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান যোগ্য। উত্তরে আমি বলি, তাঁর মূল্যায়ণে আহসান সাহেব বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসাবে অযোগ্য হতে পারেন, বাংলার অধ্যাপক হবার যোগ্যতা তাঁর আছে বলে সিলেকশন কমিটির সব সদস্যসহ আমার ধারণা এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই ধরনের শিক্ষকই আমাদের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করলে তিনি আমাকে দেওয়া তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন এবং আমারও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরে যাবার সময় এসেছে বলে আমি ধরে নেব। তিনি তাঁর পাশে বসা এক মন্ত্রী যিনি অনেকটা আমার বয়সী এবং এখনও জীবিত আছেন, তাঁর এবং সবার সামনে অনেক বিরক্তির সাথে আমার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। এর সংগে আরও একটি ফাইল তিনি নিয়ে এসেছিলেন। ফাইলে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সিলেবাস কমিটি ও তার সভাপতি নিয়োগের সুপারিশ তাঁর অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। তিনি ইসলামের ইতিহাসের জন্য অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জন্য অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের পরিবর্তে অন্য দুই জনের নাম চাইলেন। প্রথম জন তাঁর মতে, ইসলাম ও পাকিস্তান বিরোধী, দ্বিতীয় জন হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে রীট করেছেন। আমার উত্তর ছিল, উভয়েই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে আমার ধারণা। তাঁরা সরকার বা কোন ব্যক্তির যতই বিরাগ-ভাজন হোন না কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা শিক্ষক হিসাবে অবস্থান করছেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে এ দুবিষয়ে সিলেবাস তৈরীতে তাঁদের একান্ত প্রয়োজন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দায়িত্ব আমাকে যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে শিক্ষা সংক্রান্ত এসব ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। কথা কাটাকাটির পর তিনি এ সুপারিশ গ্রহণ করেন। এসব কথা মন্ত্রীসহ অন্যান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনেই হয়েছিল।

(৩) আমি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর। আইয়ুব সরকার আমলে উন্নয়ন দশক পালন উপলক্ষে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ দেওয়া হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্রোড়পত্র বের করে ১০ বছরে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়ে। চট্টগ্রামে আমার সহকর্মীদের নিয়ে (তার মধ্যে অধ্যাপক আলী আহসান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর মোহাম্মদ আলী ছিলেন) সিদ্ধান্ত নেই যে মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে এবং হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করার জন্য সেমিনার করা হবে। এ দুটি সেমিনারই

www.pathagar.com

আমি উদ্বোধন করি। প্রথমটিতে মৌলিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করা হয় এবং তা যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও পদ্ধতির পরিপন্থী সে মতামতও ব্যক্ত করা হয়। অন্যটিতে হাজার বছরের বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিস্তার ও উন্নতির চিত্র-তুলে ধরা হয় এবং এর প্রেক্ষাপটে ১০ বছর আইয়ুবী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তার উল্লেখও করা হয়। এ দুটি সেমিনার সরকার বিরোধী মনে করে চ্যান্সেলরের নির্দেশে, যারা এসব মন্তব্য করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে ব্যাপারে সরকার থেকে আমরা মতামত চাওয়া হয়। উত্তরে আমি জানাই যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে দেশের যে কোন সমস্যা বা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার উপর শিক্ষকদের নিজস্ব মতামত দেবার অধিকার আছে। যদি পাকিস্তান গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তবে এ যুক্তি মানতে হবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা যে তদানীন্তন সরকারের কোন সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা গত ১০ বছরে পায়নি, সেটা এক নির্মম সত্য। সেমিনারের আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। ঘটনার সমাপ্তি এখানেই ঘটে।

(৪) চ্যান্সেলর মোনয়েন খান একবার সহকারী রেজিস্ট্রার পদে একজন প্রার্থী নিয়োগের জন্য বেসরকারীভাবে হাতে লিখে আমাকে এক অনুরোধ পাঠান। আমরা সুপারিশকৃত প্রার্থীকে যোগ্য বিবেচনা করিনি। এ জন্য চ্যান্সেলরকে কোন কৈফিয়তও দিতে হয়নি।

(৫) একবার চ্যান্সেলর আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলরদের প্রত্যেককে বেশ কিছু কপি সবুজ রং-এর পুস্তিকা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে বিলি করার জন্য। পুস্তিকাটি চীনের নেতা মাওয়ের রেড বুক-এর অনুকরণে তৈরী। আমি এসব পুস্তিকা নিতে অপরাগতা জানাই এই অজুহাতে যে, এ ধরনের কোন রাজনৈতিক মতবাদ ভাইস চ্যান্সেলরের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার করা উচিত নয়। তিনি আর কথা বাড়াননি।

সরকার ও চ্যান্সেলরের সংগে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে আমার এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক তখন কেমন ছিল উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা অনেকটা অনুমান করা সম্ভব।

ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত মাসিকপত্র "দীপঙ্কর" (১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৭)-এ মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

'হি ওয়াজ এ গ্রেট বিল্ডার'

এম. আই. করিম

[জনাব এম. আই. করিম ১৯৪৪ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে জয়েন করেন। কমিশন পাবার পর ইটালিতে 'সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান হর্স রেজিমেন্ট'-এ কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে ভারতে ফিরে এসে ঐ রেজিমেন্টে প্রথম ইন্ডিয়ান এ্যাডজুট্যান্ট হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে এসে ১৯ নম্বর ল্যান্সার্স রেজিমেন্টে কর্মরত থাকেন। ১৯৫২ সালে কোয়াটার স্টাফ কোর্সে এবং পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে পাকিস্তান এ্যাম্বাসীর এসিস্ট্যান্ট ডিফেন্স এ্যাটাচীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের মিলিটারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে খেমকারান সেক্টরে ১৫ নম্বর ল্যান্সার কমান্ডান্টের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ওয়ার কোর্সে কোয়েটার স্টাফ কলেজে সিনিয়র ইন্টাষ্ট্রাক্টর, মুলতানে আর্মার্ড ব্রিগেডের কমান্ডান্ট এবং পরে ব্রিগেডিয়ার হয়ে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটে সিভিল এ্যাফেয়ার্সে কর্মরত থাকেন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। তারপর মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে ৬ষ্ঠ আর্মর্ড ডিভিশনের কমান্ডান্ট হন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ১৯৬৪ সালে 'সিতারা-ই-কাদেয়ে আজম', ১৯৬৮ সালে 'তমঘা-ই-পাকিস্তান' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসায়ী। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ।]

তদানিন্তন কর্নেল করিম দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর গভর্ণর সাহেবের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে গভর্ণর সাহেব সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে মনে করে আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিম্নে সে সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার স্মৃতি থেকে গভর্ণর মোনয়েম খান সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন কিনা বা বলতে ইচ্ছুক কি না?

জনাব করিম ঃ বলতে ইচ্ছুক না হবার তো কিছু নাই। তাছাড়া, আমি সাড়ে তিন বছর গভর্ণর সাহেবের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলাম। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপরই নির্ভর করতো। ফলে শুধু তাঁর ঘুমের সময়টা ছাড়া ২৪ ঘন্টাই তো আমাকে ছায়ার মতো তাঁর কাছে কাছেই থাকতে হতো। এই সুবাদে আমি মনে করি, গভর্ণর সাহেব সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশী কেউ জানেন না। কাজেই আমিই তো তাঁর সম্বন্ধে বেশী বেশী বলতে পারবো।

www.pathagar.com

সমস্ত কিছুই আমার স্মৃতিতে জাগরুক আছে, কিছুই ভুলিনি। উনার মত মহান ব্যক্তি সম্বন্ধে সব বলতে গেলে আমার কথাতেই একটা গ্রন্থ হয়ে যাবে। কাজেই সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন ঃ এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে গভর্ণর মোনয়েম খান কেমন ছিলেন?

জনাব করিম ঃ এক কথায় 'হি ওয়াজ এ গুড এডমিনিস্ট্রেটর। 'তিনি' কথা কম কাজ বেশী' এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 'শ্লো এন্ড স্টেডি' ইংরেজীতে একটা কথা আছে না, তিনিই ছিলেন তাই। 'কাজ, কাজ, আর কাজ, এটাই ছিল তাঁর নীতি। সমস্ত দিন কর্মব্যস্ত সময় কাটানোর পরও তিনি রাত ১টা ২টা পর্যন্ত কাজ করতেন। প্রায় প্রতি রাতেই তদানিন্তন ১৯টি জেলার ডি.সি.দের সাথে ফোনে কথাবার্তা বলে জেলার খবর নিতেন। এস.পি.দের সাথে কথা বলে জেলার আইন-শৃংখলার খোঁজ খবর নিতেন।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের দুই প্রদেশের উন্নয়নের ব্যবধান সম্বন্ধে গভর্ণর সাহেবের মনোভাব কি ছিল?

জনাব করিম ঃ দুই প্রদেশের উন্নয়নের ব্যবধান পূর্ব থেকেই ছিল। গভর্ণর সাহেব বরং সে ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যাপারে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন এবং তার ফলে তাঁর সময়ে সব বিষয়ে ব্যবধান অনেক কমিয়ে এনেছিলেন। একটি ঘটনা বললেই তা বুঝতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে উনি বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এই ব্যবধানের কথা। ফলে শেষের দিকে বাজেটে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় বরাদ্দ বেশী হতো। তাঁর এ ব্যাপারে ক্রমাগত প্রচেষ্টার কারণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শোয়েবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না।

প্রশ্ন ঃ একজন মানুষ হিসাবে গভর্ণর সাহেব কেমন ছিলেন?

জনাব করিম ঃ একজন মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত উচুঁ দরের ছিলেন। বাইরে কঠোরতা থাকলেও ভিতরে তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তাঁর বোয়াল মাছ খাওয়া চিকিৎসকের মতে নিষিদ্ধ ছিল। সবাই এটা জানতো। তবুও এক বাবুর্চি একদিন বোয়াল মাছ রান্না করে তাঁকে খেতে দিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী আমি বাবুর্চিকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা নিই। গভর্ণর সাহেব আমাকে ডেকে গোপনে বললেন, 'বাবুর্চি একজন গরীব মানুষ। চাকুরী গেলে চলবে কি করে। মাফ করে দাও।' এরপর বাবুর্চিকে আমি বরখাস্ত করিনি।

দেখতে অত্যন্ত রাশভাড়ী দেখালেও গভর্ণর সাহেব অত্যন্ত 'হিউমারাস' ছিলেন। কথার পিঠে কথা দিয়ে রসিকতা করতে পারতেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। একবার তাঁকে 'মিঃ ভাট্টো' বলে সম্বোধন করলে জনাব ভুট্টো বলেন যে, ভাট্টো নই আমার নাম ভুট্টো। সাথে সাথে গভর্ণর সাহেব হেসে বললেন, ইংরেজীতে যে বানান লিখেন তার উচ্চারণ ভাট্টোই হয়। 'জুলফিকার

www.pathagar.com

আলী' কত ভাল নাম, সেটা ব্যবহার না করে ভুট্টো ব্যবহার করেন কেন?
একবার শহীদ মিনার নির্দিষ্ট তারিখের আগে নির্মাণের ব্যাপারে কি করা হয়েছে তা জানতে চাইলে প্রভিন্সিয়াল মিনিস্টার ফর ওয়ার্কস মিঃ মজমাদার জানালেন যে, ওটা এখনও করা হয় নাই। ঐ ব্যাপারটাতে কিছু 'বোটল নেক'-এর সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে গভর্ণর সাহেব বললেন, 'বোতলটাই ভেঙ্গে ফেললে তো আর তার 'নেক' থাকে না।' এইভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যেও তিনি রসিকতা করতে ছাড়তেন না।

একবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। গভর্ণর সাহেব চট্টগ্রামের ডি. সি. কাজী জালাল সাহেবের নিকট থেকে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ চেয়ে পাঠান। এসব ব্যাপারে কত জলদি তিনি রিপোর্ট চান তা তো কাজী জালাল সাহেব জানতেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টটি গভর্ণরের সচিব জনাব আখলাক হোসেনের মারফত পাঠিয়ে দেন। আখলাক হোসেন সে রিপোর্ট গভর্ণর সাহেবকে হাতে হাতে দিবার জন্য গভর্ণরের ব্যক্তিগত খেদমদগার গোলাম রসূলকে দেন। গোলাম রসুল ঘরে ঢুকে দেখেন গভর্ণর সাহেব ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন কিংবা ঘুমিয়ে গেছেন। তো গোলাম রসুল চুম্পিসারে বালিশের নিচে রিপোর্টটি রেখে চলে আসেন। পরে সেকথা ভুলে যান। পরদিন গভর্ণর সাহেব রিপোর্টের ব্যাপারে কাজী জালাল সাহেবের কাছে তাগাদা দিলে তিনি রিপোর্টটি সাথে সাথে আখলাক হোসেনের মারফত পাঠানোর কথা বললে আখলাক হোসেন আচার গোলাম রসুলের কথা বলে। গোল রসুল তখন বাধ্য হয়ে বালিশের নিচে রাখার কথা স্বীকার করেন। ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু গর্ভণর সাহেব হালকা রসিকতা করে বললেন, 'আমাদের কারো দোষ নাই। তাহলে ঐ বালিশেরই সব দোষ।'

আর একটা ঘটনা বলি। অবসরপ্রাপ্ত নেভী চীফ এডমিরাল সিদ্দিক পরে বেকো ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তিনি গভর্ণর সাহেবকে জানালেন যে, 'আমরা দেশীয় জিনিস তৈরী করছি কিন্তু বি.এ.ডি.সি বিদেশী জিনিস ব্যবহার করছে। আপনি চেষ্টা করে বিএডিসিকে আমাদের জিনিষ ব্যবহারে রাজী করাতে পারেন কি না? গভর্ণর সাহেব রসিকতার সাথে বললেন, 'বি.এ.ডি,সি,-র চেয়ারম্যান মিঃ হ্যাচ বার্নওয়েল হচ্ছেন একজন ইংলিশ ম্যান, চীফ সেক্রেটারী আলী আসগর সাহেব তো পশ্চিম পাকিস্তানী, আমার সেক্রেটারীও পশ্চিম পাকিস্তানের। সবাই তো বিদেশী। আমি একা পূর্ব পাকিস্তানী। আসলে তো এরা সবাই আপনাদেরই লোক। এরাই যদি না করলো তো আমার করার কি আছে?'

প্রশ্ন ঃ একজন মুসলমান হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন?

জনাব করিম ঃ তিনি নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। পোষাকে

www.pathagar.com

পরিচ্ছদে যেমন মুসলমান ছিলেন তেমনি মনেপ্রাণেও তিনি পরহেজগার ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীও খুব কঠোর ছিলেন। সমস্ত দিন-রাত্রির কর্মক্লান্ত শরীরে ভোরে একটু ঘুমের জন্য কোন কোন দিন ফজরের সময়ে যদি না জাগতেন তবে উনার স্ত্রীর তাগাদা ও ঠেলাঠেলিতে উঠতে বাধ্য হতেন।

পরিবারের মেয়েরা ইসলামী নিয়মে পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। আমার তো বাসার ভিতরে বাইরে চলাচলের অধিকার ছিল। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর আমি তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলাম। সমগ্র পরিবারের সমস্ত কিছুই আমার তদারকিতে হতো। কিন্তু সাড়ে তিন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর স্ত্রীর চেহারা দেখতে পাইনি। অনেক ব্যাপারে অনেক কথা হতো তাঁর স্ত্রীর সাথে কিন্তু তা তিনি পর্দার আড়াল থেকেই বলতেন।

প্রশ্ন ঃ গভর্ণর সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবার কেমন ছিল?

জনাব করিম ঃ তিনি একেবারে 'নীট এন্ড ক্লীন' ছিলেন। তাঁর সখ এবং অভ্যাস ছিল সাদা পাজামা এবং গিলাকরা পাঞ্জাবী পরিধানের, আনুষ্ঠানিক পোশাক ছিল আচকান ও পাজামা। মাথায় টুপি তো তাঁর সব সময় থাকতোই।

খাবারের ব্যাপারে রাজসিক কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের মতই খেতেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মতে কিছু কিছু খাবার তিনি খেতেন না।

প্রশ্ন ঃ প্রদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় গভর্ণর সাহেব কি কিছু অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নিতেন?

জনাব করিম ঃ প্রশ্নই আসে না। তাঁর মতো নীতিবান মানুষ কখনই এমন কাজ করেননি। বরং পাছে লোকে কিছু বলে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাও নিতে চাইতেন না।

যেমন, একবার বিদেশের স্টাইপেন্ডের ব্যাপারে তাঁর এক ভাইয়ের ছেলের কথা উঠলে তিনি আপত্তি করেন। আমরা বুঝালেও তিনি বুঝতে চাননি। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁকে বললেন, 'এটাতে আপনার আপত্তি করা ঠিক না। কারণ আপনি যদি গভর্ণর না হতেন এবং সে অবস্থায় আপনার ভাতিজা যদি যোগ্যতা বলে স্টাইপেন্ড পেত তাহল কি আপনি আপত্তি করতেন? গভর্ণরের ভাতিজা বা ছেলে হবার কারণে কি নিজ যোগ্যতা বলে তার পাবার অধিকার হারাবে? এরপর গভর্ণর সাহেব আর কোন কথা বলেননি।

এখন ধানমন্ডির যে প্লটে ম্যাগডোনালস চাইনিজ রেস্তোরাঁ আছে সেই প্লটটি তাঁর নামে বরাদ্দ হয় গভর্ণর হবার অনেক আগে, তিনি ময়মনসিংহ থাকা অবস্থায়। নিয়মিত দরখাস্ত করেই তিনি ঐ প্লটের বরাদ্দ পেয়েছিলেন। অথচ গভর্ণর হবার পর তিনি ঐ প্লটের দখল নিতে ইতঃস্তত করছিলেন। আমরা অনেক বুঝিয়ে তবে

www.pathagar.com

তাঁকে রাজী করাই। কাজেই বুঝতে পারছেন কোন অন্যায় সুবিধা নেবার প্রশ্নই ওঠে না তাঁর মত মানুষের পক্ষে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি ধরে নেব যে তিনি ভীতু ছিলেন?

জনাব করিম ঃ জ্বী না, তিনি ভীতু ছিলেন না। নিজের এসব ব্যাপারে তাঁর অবশ্য ইতঃস্তত ছিল কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তিনি খুব সাহসী ছিলেন। একটা ঘটনা বলি ঃ ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পূর্বে জানা গেল যে ছাত্ররা সেখানে গোলমাল করবে। তৎকালীন ডি.আই.জি ইনটলিজেন্স জনাব আবদুল হক তো একেবারে পায়ে ধরার মত। তিনি কিছুতেই গভর্ণর সাহেবকে ঐ অনুষ্ঠানে যেতে দিবেন না। কিন্তু গভর্ণর সাহেবের এক কথা, 'আমি চ্যান্সেলর। অতএব আমাকে যেতেই হবে।' সত্যিই তিনি গেলেন। অনুষ্ঠানের পিছন দিকে ছাত্ররা গোলমাল করছিল। চেয়ার ভাঙ্গা, ঢিল ছোঁড়া, শ্লোগান ইত্যাদি চলছিল। পুলিশের লাঠিচার্জও চলছিল। অথচ গভর্ণর সাহেব ছিলেন নির্বিকার। তাঁর দায়িত্ব তিনি রুটিন মাফিক পালন করেই যাচ্ছিলেন। নির্দিষ্ট পোশাক পড়লেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন, এমনকি তাঁর নির্ধারিত ভাষণ তিনি শেষ লাইন পর্যন্ত পড়লেন। তাঁর সাহসিকতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। এ রকম আরো অনেক ঘটনায় তিনি যে সাহসী ছিলেন তাঁর প্রমাণ তিনি রেখেছেন।

সর্বশেষ, দেশে যখন গোলমাল চলছে তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গভর্ণর সাহেবকে ঢাকায় আসতে দিতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি ঢাকায় যাব'। হাতি মরে গেলেও তার দাম লাখ টাকা।' ঢাকায় যাবার পর আমি রাও ফরমান আলীকে ফোন করেছিলাম গভর্ণর সাহেবের বাসায় সিকিউরিটির ব্যবস্থা নিবার জন্য। কিন্তু গভর্ণর সাহেব তাঁর বাসায় সিকিউরিটি গার্ড নিতে অস্বীকার করেন।

প্রশ্ন ঃ গভর্ণর সাহেব বক্তৃতা দিতে কি রকম পারদর্শী ছিলেন?

জনাব করিম ঃ তিনি একজন অস্বাভাবিক বক্তা ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। আর দীর্ঘ বক্তৃতায় খেই হারাতেন না। আর মজার ব্যপার ছিল, বক্তৃতার মাঝে তিনি সুন্দর সুন্দর আরবী, ফার্সীর বয়াত যোগ করতে পারতেন। একবার গোপালগঞ্জে এক মিটিং-এর সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিল। কিন্তু তবুও তিনি বক্তৃতা দিয়েই চলেছেন। কিছুক্ষণ পরপর আমি তাঁর কানে কানে ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলছি, আর তিনি প্রতিবারই বলছেন 'আর এক মিনিট'। এই করতে করতে তিনি দীর্ঘ আড়াইঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন।

আর একবার চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যেতে রাস্তায় কিছুদুর পর পর ২০/২৫টি সমাবেশে ভাষণ দিতে দিতে কক্সবাজার পৌছলেন। এতগুলো সমাবেশে অনর্গল

www.pathagar.com

বক্তৃতা করার অন্য কারও রেকর্ড খুব কমই আছে। তাছাড়া অন্যান্যের মত সস্তা হাততালি পাবার জন্য সেরকম বক্তৃতা তিনি দিতেন না। তাঁর বক্তৃতায় দেশপ্রেম ও উন্নয়ণ কর্মকান্ডের কথাই থাকতো।

প্রশ্ন ঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?

জনাব করিম ঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সোনায় সোহাগার মত। এই দুইজন এক মতের ও এক পথের ছিলেন বলেই পূর্ব পাকিস্তানে সেই সময় উন্নয়নের জোয়ার এসেছিল। এত সব উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। দেখেন না, পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশের উল্লেখ করার মত সব প্রতিষ্ঠান ও মিল-কারখানাই মোনয়েম খানের আমলে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যসবগুলোর কথা বলবো না, শুধু আমি যেটার সাথে জড়িত ছিলাম সেটার কথাই বলি। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার কথা। একটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হলো। তো কোথায় হবে সে ইউনিভার্সিটি? শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান বাসেত চাচ্ছিলেন সিলেটে, শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দিন চাচ্ছিলেন কুমিল্লায়। শুধুমাত্র আমি চট্টগ্রামের লোক হিসাবে চট্টগ্রামে করার ইচ্ছুক ছিলাম। গভর্ণর সাহেবকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, বন্দরনগরী চট্টগ্রামেই ইউনিভার্সিটি হলে সব দিক থেকে ভাল হবে। প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী জেনারেল রফি, চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব সালাউদ্দিন এবং আমাকে নিয়ে রাতারাতি গভর্ণর সাহেব ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামেই স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তে অন্য কারও হাত ছিল না। এই ভিতরের ঘটনা আমার চাইতে ভাল আর কেউ জানেন না। এখন তো কতজনই এই ক্রেডিট নিতে চান। গভর্নর সাহেবের কঠোর সিদ্ধান্তের মাত্র ১০ মাসের মধ্যে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই ১০ মাসের মধ্যে অনেকবার তিনি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। শেষে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উদ্বোধন করেছিলেন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি।

সাক্ষাৎকারের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

জনাব করিম ঃ আপনাকে ও ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

'প্রশাসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন'

পি. এ. নাজির

[জনাব পি.এ. নাজির একজন সি.এস.পি অফিসার। পাকিস্তান আমলে ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিপুটি কমিশনার এবং কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি ডিআইটির চেয়ারম্যান হন।]

বদলির হুকুম হল দেশের সর্ববৃহৎ জেলা মোমেনশাহীতে। নির্ধারিত দিনে রাজশাহী ছাড়লাম। সরকারী অফিসার, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর লোক এবং শহরবাসী রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে জমকালভাবে বিদায় জানাল। .....

রাতে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের ফোন এল। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, তিনি জেলার সীমান্ত সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার আশু সমাধান চান এবং সর্বোপরি জেলায় একটা সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চান– এ লক্ষ্যেই তিনি নিজে পছন্দ করে আমাকে ও এস.পি.কে এখানে এনেছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কখনই জেলা প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না, তাঁর তরফ থেকে অন্যায় অনুরোধ করা হবে না এবং কেউ যদি এ রকম করে তবে আমি নির্ভয়ে, শক্ত হাতে তার মোকাবিলা করতে পারব। এসব বিষয়ে আমি তাঁর সহযোগিতা পাব এবং তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব।

ফোন ছেড়ে আমার মোটামুটি ভাল লাগল। গভর্ণরের নিজের জেলায় আসার পর মনে কিছু দ্বিধা ছিল, কথা বলার পর তা কেটে গেল।

পরদিন জামালপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, সদর উত্তর এবং সদর দক্ষিণ-এর এসডিও এবং তিন জন এডিসিকে নিয়ে এক বৈঠকে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনা হল জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে।

নেত্রকোনায় এসডিও সিএসপি রফিকুল্লাহ্ চৌধুরী বৈঠকে তাঁর মহকুমার অবস্থার একটা চমৎকার বর্ণনা দিলেন। অন্য চার জন এসডিও তাঁদের নিজ নিজ মহকুমার চিত্র তুলে ধরলেন। এসপি সাহেব সীমান্তের অবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন। বললেন, মিশনারীদের কারণে এই সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে।

মজার কথা, সীমান্তের ওপর থেকে বিতড়িত অসহায় মানুষদের সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও বললেন না। অথচ এই মানুষগুলো একদিন আসামে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আসামে 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন সেই বরদোলাই সরকারের সময় থেকেই বলতে গেলে চলে

www.pathagar.com

আসছে। নানা অজুহাতে এসব মানুষকে বিতাড়িত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই যে কবে শুরু হয়েছো 'বাঙ্গাল খোদও' আজও তা শেষ হয়নি।

সীমান্তে পাদ্রিরা তাদের 'দুষ্টামি' চালিয়ে যেতে লাগল। বলে রাখি' ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগেই এই সব উস্কানিমূলক কাজ সীমান্তের ওপার থেকে করা হচ্ছিল, যাকে বলে দেশের মানুষকে মানসিক দিকে থেকে প্রস্তুত করার জন্য। উপরন্ত কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা পাকিস্তানকে তার সাহায্য স্থগিত ঘোষণা করল-ভারতকে ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে তার সৈন্য চলাচল করার অনুমতি না দেবার কারণে।

পরবর্তী দু'বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের পর ১৯৬৩, '৬৪ সালে অবস্থা সৃষ্টি করে ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে ভারত লাহোর আক্রমণ করে বসে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে ভারত অবশ্য কিছুই বাকি রাখেনি। সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে চাকরি করে এই সত্যটি খুব ভাল করেই বুঝেছিলাম।

সেই রাতের বেলা ছুটলাম টাঙ্গাইল থেকে মোমেনশাহী আর সেখান থেকে এসপিকে নিয়ে হালুয়াঘাট। থানায় বসে ঘটনা বিস্তারিত সব জানলাম। ইপিআর কমান্ডারকে তলব করা হল। তিনি সব দোষ পাদ্রির ওপর চাপালেন। .....

শেষ রাতে নিজের বাংলোয় ফিরে শুনলাম লাট সাহেব দুবার ফোন করেছিলেন। সাথে সাথে ঢাকায় ফোন লাগান হল। গভর্ণর সাহেব ঘটনা জানতে চাইলেন এবং তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'ভুট্টো সাহেব সকালেই চিৎকার শুরু করবেন। কারণ পাদ্রির ঘটনা ইতিমধ্যেই পিন্ডি পৌছে গেছে।'

সকালে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠালাম সরকারের কাছে।

পরদিন ঢাকা থেকে একজন বড়সড় পাদ্রি ওয়ানার সোজা হালুয়াঘাট চলে গেলেন। ফেরার পথে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। আমি রাজি হলাম না। স্থানীয় এসডিও'র সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলাম। তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল যে, বিনা অনুমতিতে হালুয়াঘাট সফর করার জন্য তাঁকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার করা যেতে পারে। গ্রেফতারের কথা শুনে পাদ্রিটি মুহূর্তের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেলেন।

সামনে ঈদুল আযহা। মোমেনশাহী শহরে মোনয়েম খান সাহেব একটা বড়সড় ঈদগাহ তৈরী করিয়াছেন; পুকুর ও সারি সারি নারিকেল গাছ জায়গাটাকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঈদগাহ কমিটির তিনি সেক্রেটারী আর ডিসি পদাধিকার বলে সভাপতি। তিনি গভর্ণর হবার পরও এতে কোন হেরফের হয়নি। বছরে দুটো ঈদের অন্তত একটাতে তিনি শরীক হন। এবার তিনি আসতে

www.pathagar.com

পারছেন না বলে তাঁর বক্তৃতা ছাপিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঈদের জামাতে সেটা পড়ে শোনাবারও অনুরোধ করলেন। ঈদের দিন ঈদগাহে আমি তাঁর মুদ্রিত ভাষণটি উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করে দিলাম।

.....

কয়েকদিন পর গভর্ণর মোনয়েম খান সফরে এলেন। পুরো সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পালিয়ে গিয়েছিল যে সব উপজাতি, তাদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তাদেরও দেখলেন। তিনি খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। বললাম, 'স্যার, সরকার মোড়লি না করায় এত তাড়াতাড়ি এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।' খুশী মনেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় ফটো তুলে পাঠাতে বললেন। কারণ ভুট্টো সাহেব রোমে মহামান্য পোপকে সেসব ছবি দেখাবেন। তিনি আরো জানালেন যে, শিগগিরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব স্বয়ং এই এলাকা সফর করবেন।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা পাল্টে গেল। পাদ্রির ও ভারতীয়দের অপপ্রচার সত্ত্বেও উপজাতিরা নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে আসতে শুরু করল। আর মোহাজেররাও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। যে সব মোহাজের উপজাতিদের জমি ইতিমধ্যে চাষ করেছে তারা জমির মালিককে অর্ধেক ফসল দেয়ার অঙ্গীকার করল। এতে দু'পক্ষই লাভবান হল। এদের মধ্যে বাড়ল বিশ্বাস ও সম্প্রীতি। .....

একদিন রাত সাড়ে বারোটায় ফোন এল। গভর্ণর মোনয়েম খানের কণ্ঠে ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে 'ডিসি সাহেব কি করছেন?' বললাম, 'স্যার, ঘুমানোর চেষ্টা করছি।' তিনি আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করে বললেন, 'আপনার স্টেশন থেকে মানে মোমেনশাহী শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কোন এক স্থানে একটি গুরুতর চুরি সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কি? আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এটা পুলিশের ব্যাপার। তারা এ একম কিছু এখনো পর্যন্ত আমাকে জানায়নি।' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন, বিষয়টি আন্তর্জাতিক রূপ নিতে পারে। সুতরাং আপনি খোঁজ খবর নিন। তবে খুব দ্রুততার সাথে সব করতে হবে এবং ভোর হবার আগেই আমাকে জানাতে হবে। কারণ, সকালে এ বিষয়ে আমাকে পিন্ডিতে কথা বলতে হবে। পারবেন তো? বললাম, ইনশাল্লাহ আমার চেষ্টর কোন ত্রুটি হবে না।' মনে হল আমার কথায় তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পেরেছেন। বললেন, 'আপনি মিশন শেষে ফিরেই আমাকে ঘটনা জানাবেন। ঘুমিয়ে থাকলেও জাগিয়ে খবরটা দেবেন।'

আমরা আর দেরী করলাম না। মধুপুরের উদ্দেশ্যে দলবল নিয়ে রওয়ানা হয়ে

www.pathagar.com

গেলাম। যেতে যেতে ওসি বললেন, 'শুনেছি রাতে গির্জার ভেতরে থেকে নাকি কি একটা চুরি হয়েছে। তবে গির্জা কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে কোন অভিযোগ করেনি। আমরা যা শুনেছি তা সবই লোক মুখে।' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল দিনের বেলায় ঢাকা থেকে কেউ গির্জায় এসেছিলেন? ওসি অবাক হয়ে বললেন, 'জি স্যার, এসেছিলেন। তবে কাল নয় পরশু আর্চ বিশপ ওয়ারনার নামে এক ফরেনার এসেছিলেন। শুনেছি তিনি এই প্রদেশের খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতা।' 'পরশু কখন এসছিলেন তিনি?' আমি জানতে চাইলাম। ওসি বললেন, 'বিকেলে এসে সন্ধ্যায় চলে গেছেন। খুব অল্প সময় ছিলেন এখানে।'

এসপি সাহেব স্থানীয় পাদ্রিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। দরজা-জানালা সব অটুট আছে। দরজার তালায়ও কেউ হাত দেয়নি। অথচ ভেতর থেকে একটা বাটি গায়েব। ভুতটুত ছাড়া ওটা কারো পক্ষে হাতিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। .....

হাতে সময় খুবই কম। তাই আর দেরী না করে দ্রুত মোমেনশাহী শহরে প্রত্যাবর্তন করলাম। প্রথম কাজ হল ঢাকায় ফোন লাগান। গভর্ণর মোনয়েম খান নিজে ফোন উঠালেন। মনে হল এতক্ষণ তিনি অধীর আগ্রহে আমার ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় অভিযানের বর্ণনা দিয়ে বললাম 'এটা ওয়ারনারের একটা চক্রান্ত। চুরিটুরি কিছুই হয়নি। হালুয়াঘাটে ফাদার পোপের দুষ্টমি আর মধুপুরে ওয়ারনারের চক্রান্ত একই সূত্রে গাঁথা। আমি আর এসপি মিলে এক্ষুণি রিপোর্ট লিখে মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে পিন্ডিতে জানান যেতে পারে যে, চুরির ঘটনা সত্য নয়, পাকিস্তানের দুর্নাম করার জন্য এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মাত্র।'.....

যুদ্ধ শেষে (১৯৬৫) গভর্ণর মোনয়েম খান এলেন মোমেনশাহী জেলা সফরে। যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অজানা কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন এক বৈঠকে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা আমাদের উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ– যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে যখন পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন– তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি (মোনয়েম খান) যদি এই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তবে তাঁর দল সর্বোতোভাবে তাঁকে সমর্থন দেবে। আর এটা শুধু নৈতিক বা আনুষ্ঠানিক সমর্থনই হবে না; হবে সর্বাত্মক সমর্থন। যুদ্ধাবস্থায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এই জন্য জনাব খান বিষয়টি চেপে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বিষয়টি পিন্ডিকে জানিয়েছেন। .....

প্রেসিডেন্ট আর গভর্ণরের সফরের সময় পেশাদার আমলারা ওপরে ওঠার

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় কোন কিছুই করতে বাদ রাখতেন না। এ জন্য প্লেন উড়িয়ে তাঁদের মাথায় গোলাপের পাঁপড়ি বর্ষণ করতে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি, তাঁদের খুশীর জন্য রাস্তার দু'পাশে সম্বর্ধনার নামে যুবতী মেয়েদের নাচাতে ও গাওয়াতে। দেখেছি তোষামোদের প্রতিযোগিতা।

তোষামোদের কথাই যখন উঠল, এখানে বলে রাখি, চাটুকারীতার প্রতিযোগিতায় সকল পেশার লোককেই অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। এটা আমার প্রত্যেক্ষ অভিজ্ঞতা। এখানে একটা ঘটনা বলি। একদিন আমার এক পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোক, যিনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত, বরিশাল থেকে ফোন করে জানালেন তিনি মোমেনশাহী আসছেন। তাঁর অবস্থানকালে তিনি আমার সাথেও দেখা করতে চান। আমিও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছি তাঁর সাথে দেখা করার একটা আগ্রহ আমার মধ্যেও জেগে উঠল।

মুশকিল হল ভদ্রলোক যেদিন আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন ঐ একই দিন গভর্ণর মোনয়েম খানও মোমেনশাহী সফলে আসছেন। বলা বাহুল্য, আমি গভর্ণরের সফর নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তবুও শিক্ষক ভদ্রলোকের সাথে একটা মোলাকাতের সময় বের করে নিলাম। ভদ্রলোক তখন বরিশাল বি.এম. কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় অথবা মোমেনশাহীর এ. এম. কলেজে বদলি হয়ে আসতে চান। বুঝতে পারলাম এটা তাঁর নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়। আসলে তিনি আমার কাছে তদবিরে এসেছেন। তিনি আমাকে সরাসরি বললেন আমি যেন গভর্ণর সাহেবকে বলে এই বদলির ব্যবস্থা করে দেই। আমি তাঁকে কোন মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে সত্য কথাটাই বলে দিলাম। বললাম, আমি কারো জন্যই এ পর্যন্ত কোন তদবির করিনি। তা ছাড়া এ. এম. কলেজটি গভর্ণর সাহেবের নিজের শহরে, তাই এ ব্যাপারে হয়তো বা তাঁর নিজস্ব কোন চিন্তা-ভাবনা আছে। সুতরাং অনুরোধ করে ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। ভাল হয় যদি তিনি গভর্ণর সাহেবকে আমার উপস্থিতিতে প্রস্তাবটি দেন এবং গভর্ণর সাহেব যদি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি তাঁর পক্ষেই আমার মতামত জানিয়ে দেব।

গভর্ণর সাহেব মফঃস্বলে একটি প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে তাঁর মোমেনশাহী শহরের বাড়ীর বসবার ঘরে এসে বসলেন। আমরা তাঁর আসার আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। ওখানে আরো দশবারো জন লোক হাজির ছিলেন। মোনয়েম খান সাহেব একটা সোফাতে আসন গ্রহণ করার সাথে সাথেই অধ্যক্ষ ভদ্রলোক আমাদের সবাইকে বিস্ময় বিমুঢ় করে দিয়ে গালিচায় বসে পড়ে গভর্ণরের পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করলেন এবং ঐ অবস্থাতেই বিনীত কণ্ঠে

www.pathagar.com

তাঁর আর্জিটাও পেশ করলেন। গভর্ণর সাহেবও হঠাৎ সাপ দেখে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, তেমনি লাফিয়ে উঠে পড়ে বললেন, আরে করেন কি, করেন কি সাহেব, আপনি একজন প্রিন্সিপাল, এটা কি করছেন!

দুর্ভাগ্যের বিষয় এতকিছু করেও অধ্যক্ষ সাহেব আমার থাকাকালীন সময়ে এ. এম. কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে মোমেনশাহীতে আসতে পারেননি। একজন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক এবং একটি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল যে সামান্য একটি বদলির ব্যাপার নিয়ে গভর্ণরের পায়ে পড়তে পারেন এটা ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ভদ্রলোকই আজকাল দেশের সেরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একজন হিসাবে পরিচিত এবং মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে নানা বিষয়ে বুদ্ধিব্যবসায়ীরা যে সব বিবৃতি দিয়ে থাকেন তাঁর নামটা গোড়ার দিকেই দেখা যায়। শিক্ষকদের চরিত্রের গুণাগুণ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমবেশী প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আজকে শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্য এবং হতাশা এর পেছনে শিক্ষক নামের এইসব মেরুদণ্ডহীন চাটুকারদের ভূমিকাই যে দায়ী তাতে আর সন্দেহ নেই। .....

একথা আমি নিঃসংকোচে বলব যে, প্রশাসক হিসাবে মোনয়েম খান সাহেব যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। গভর্ণর আজম খান ও গোলাম ফারুক সাহেবের অধীনেও চাকরি করেছি। আমি মনে করি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের চেয়ে মোনয়েম খান অনেক বেশী সফল ছিলেন।

গভর্ণর মোনয়েম খান তাঁর একজন সহকারীর মাধ্যমে প্রদেশের নানা জরুরী খবরা-খবর সংগ্রহ করতেন। এই সহকারী বিভিন্ন ডিসি, এসডিও, সার্কেল অফিসার ও ওসির কাছে ফোন করে জানতে চাইতেন ধান, চাল, নুন, কেরোসিন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কত, ফসলের অবস্থা কি এবং কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। বছরের প্রতিটি দিন এ কাজ রুটিন মাফিক চলত। কখনো এর কোন ব্যত্যয় দেখিনি।

সেক্রেটারীদের মিটিং-এ দেখেছি বাঘা বাঘা অফিসাররা বেকায়দায় পড়ে গেছেন, নাজেহাল হয়েছেন চরমভাবে। কারণ সেক্রেটারী সাহেবদের পক্ষে অত বিস্তারিত ও তাজা খবর সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারা যে সব তথ্য পেতেন তা নানা হাত ঘুরে তাঁদের কাছে পৌছতে পৌছতে পনের দিন লেগে যেত। অথচ গভর্ণর সাহেবের কাছে থাকত একেবারে লেটেস্ট ইনফরমেশন। টেলিফোনের মাধ্যমে দেশের অবস্থা জানার এই সামান্য ব্যবস্থা তাঁকে অসামান্য প্রশাসক করে তুলেছিল।

www.pathagar.com

'গভর্ণর মোনয়েম খানের আচরণে নিজস্ব এক বিশেষত্ব ছিল'

বি. এম. আব্বাস এ. টি.

[বি.এম. আব্বাস এ.টি. একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পানি বিশেষজ্ঞ। ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার সেচ বিভাগে অস্থায়ী প্রকৌশলী হিসাবে চাকরী শুরু করে তিনি আপন কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে একাধিক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।]

ক্রুগ মিশন কি বলেছে তা জানতে চান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান। তাঁকে ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একদিন তিনি আমাকে প্রাতঃরাশে ডাকলেন। ১৯৬৪ সালের ১৬ই আগস্ট। আমি ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কমিশনার। গভর্ণর হাউজে গিয়ে অপেক্ষা করছি গভর্ণরের জন্য। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তখনকার পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুস সবুর খান। তাঁকেও গভর্ণর ডেকেছেন প্রাতঃরাশে।

সবুর খান ও আমি অপেক্ষা করছি। গভর্ণর বসবার ঘরে ঢুকলেন ডি. এল. রায়ের (দ্বিজেন্দ্র লাল রায়) একটি বিখ্যাত কৌতুক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে। কয়েকটা লাইন অনেকটা এই রকম, "একটা নূতন কিছু করো, একটা নূতন কিছু করো, আর কিছু না পার তো বৌকে ধরে মার।" জিজ্ঞাসা করলাম-কি ব্যাপার, হঠাৎ বৌকে নিয়ে কেন? তিনি বললেন, আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি যে বিয়েই করেননি। আর সবুরও প্রায় সেই দলে। তারপর আমরা খাওয়ার টেবিলে বসলাম। কিন্তু ক্রুগ মিশন সম্পর্কে কোন কথাই হল না। এর পরে রিপোর্টের কথা উঠল দূর পাল্লার টেলিফোনে। একদিন বিকাল বেলা গভর্ণরের ফোন পেলাম রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। সেদিন ১৯৬৫ সালের ১৬ই জুলাই। রাত্রে তিনি আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করবেন, তাই ফোনে আমার কাছে জানতে চান ক্রুগ মিশনের রিপোর্টে কি ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ফোনে রিপোর্টের বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে বললাম। শেষকালে জানালাম যে, ক্রুগ মিশনের সুপারিশগুলি এখন কার্যকর করা হচ্ছে। তিনি বললেন, এতক্ষণ এটা বলেননি কেন?

গভর্ণর মোনয়েমের কাজ করার ধরনে, কথাবার্তায়, আচরণে নিজস্ব এক বিশেষত্ব ছিল। কথা বলতেন অনেক সময় কাটাকাটা। কিন্তু সে রকম ভাবে জবাব দিলেও মনে কিছু নিতেন না। তাঁর কথার ধরনে হাসির খোরাক থাকতো। কিন্তু নিজে তিনি এসব কথা গম্ভীরভাবে বলতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর অফিস কামরায়

www.pathagar.com

ফারাক্কা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। আলোচনার সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ডঃ এম. এন, হুদা ও চীফ সেক্রেটারী আলী আসগর। আমি গভর্ণরের সামনের চেয়ারে বসে। হঠাৎ গভর্ণর আমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। সবাই একটু তটস্থ হলেন প্রশ্নের ধরন দেখে। তিনি আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন বলে মনে হত না। কিন্তু এখনও আমার প্রতি রুঢ় ব্যবহার করেননি। প্রশ্ন ও উত্তর অনেকটা এরকম হল। কিছু ইংরেজী, কিছু বাংলায়।

গভর্ণর ঃ আপনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন কখন?

উত্তর দিলাম।

ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রী কবে পেয়েছেন?

তারও উত্তর দিলাম।

গভর্ণর বললেন, তখন তো আমি ওকালতি করছি, তাও অনেকদিন ধরে। আমি বললাম যে, তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। গভর্ণর তখন মন্তব্য করলেন, আপনার এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, আর ফারাক্কার ব্যাপারে কিছু করতে পারছেন না? ফারাক্কার কাছে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারেন না, যাতে নদীর পানি কলকাতার দিকে না গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে হুড় হুড় করে নেমে আসে? গভর্ণর মোনয়েম খান অফিসের কাজ করতেন অনেক রাত্রি পর্যন্ত এবং বেশি রাত্রে অফিসারদের ফোন করতেন। একবার মধ্যরাত্রে আমাকে উঠতে হল। তারপর তাঁর সঙ্গে ফোনে চললো কথাবার্তা। অনেকটা এই রকম।

গভর্ণর ঃ আপনি ঘুমাচ্ছিলেন?

আমি ঃ হ্যাঁ স্যার।

গভর্ণর ঃ আপনাকে ঘুম থেকে উঠালাম?

আমি ঃ তাতে কি!

গভর্ণর ঃ আপনি কি মনে করেন আপনি ঘুমিয়ে থাকলে নদীর স্রোত বন্ধ থাকবে? আমি আর বললাম না যে, আমি না ঘুমালেও নদীর স্রোত বন্ধ থাকবে না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে স্যার? তখন তিনি হারাগাছায় তিস্তা নদীর ভাঙ্গন বন্ধ করার জন্য যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার অগ্রগতি না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং সুপারিনটেণ্ডিং ইনজিনিয়ারের সমালোচনা করলেন। বোধ হয় তাঁর কাছে এ অঞ্চলের লোক বসা ছিল। এতক্ষণ বাংলায় কথা হচ্ছিলো। এবার আমি ইংরেজীতে বললাম যে, আপনার সরকারকে বারে বারে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এ কাজে কোন টাকা বরাদ্দ করেনি। সুপারিনটেণ্ডিং ইনজিনিয়ার কি করবেন? গভর্ণর বোধ করি একটু অপ্রস্তুত হলেন। আমাকে বললেন তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে। এমন কি কেমন করে লিখতে হবে, তাও বলতে আরম্ভ করলেন।

www.pathagar.com

'হি ওয়াজ এ গুড এ্যাডমিস্ট্রেটর'

সৈয়দ শামীম আহসান

[সৈয়দ শামীম আহসান সি.এস.পি কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।]

গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খানের সময় প্রথমে আমি বাগেরহাটের এস.ডি.ও. ছিলাম। সে সময় গভর্ণর সাহেবের সেক্রেটারী ছিলেন জনাব আখলাক হোসেন। যিনি ১৯৫৪ সালের সি.এস,পি. ছিলেন। আমাকে বদলী করা হয় চুয়াডাঙ্গার এস.ডি.ও. হিসাবে। জয়েনিং টাইমিং ছিল ৬ দিনের। ঐ সময়ে ঢাকায় হঠাৎ দেখা হয় আখলাক হোসেন সাহেবের সাথে। তিনি বললেন, 'আমার কাছে আসতে চাও?' আমি বললাম, 'আপনার ইচ্ছা হলে আমার আপত্তি নাই।' উনি গভর্ণর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন আমাকে। স্যার এফ. রহমান আমার নানা। গভর্ণর সাহেব শিক্ষক হিসাবে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কাজেই এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। আমি গভর্ণর সাহেবের ডিপুটি সেক্রেটারী হিসাবে জয়েন করলাম।

প্রায় দুই বছর আখলাক সাহেবের সাথে কাজ করলাম। দুইজনে মিলে সব ফাইল ঠিকঠাক করার পর আখলাক সাহেবই সেসব ফাইল 'পুট' করতেন। আমি গভর্ণর সাহেবের সামনে যেতে সংকোচ করতাম। পরে আখলাক সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হয়ে গেলেন। গভর্ণর সাহেবের সেক্রেটারী হলেন চট্টগ্রামের তৎকালীন ডি.সি. কাজী জালাল সাহেব। কিন্তু তিনি জয়েন করতে পারলেন না। কারণ এসময় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। উপর থেকে অর্ডার এলো প্রত্যেক অফিসারকে নিজ নিজ অবস্থানেই থাকতে হবে। কাজেই কাজী জালাল সাহেব চট্টগ্রামেই থেকে গেলেন। ফলে গভর্ণর সাহেবের যাবতীয় কাজ আমাকে দেখতে হতো।

আমি তখন চামেরী হাউসে থাকতাম। যুদ্ধের পর একদিন গভর্ণর সাহেবের সাথে কড়িডোর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাবার সময় উনি বললেন, তুমি গভর্ণর হাউসে চলে আস। কাজের সুবিধা হবে। আমি দ্বিধার সাথে বললাম, ঠিক আছে। সেদিনই গভর্ণর সাহেব চীফ সেক্রেটারী আলী আসগরকে বললেন, এই ছেলে যুদ্ধের এই সংকটের সময় সব কাজ করে থাকতে পারলে আমার অন্য সেক্রেটারীর দরকার কি? ফলে আমি বড় দায়িত্ব পেলাম।

গভর্ণর সাহেব যেমন আমাকে বিশ্বাস করতেন এবং স্নেহ করতেন, আমিও তেমনি বিশ্বস্ততার সাথে সব কাজ আঞ্জাম দিতাম। কিন্তু একটা ঘটনায় উনি একদিন

www.pathagar.com

অনেকের সামনে আমাকে অবিশ্বাসী বলে বকা দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। ঘটনাটা এ রকম– হবিগঞ্জের এস.ডি.ও. গাজী সাহেব যৌনশিক্ষার উপর একটা বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। হবিগঞ্জ অঞ্চলে এই বই-এর তীব্র বিরোধীতা হয়। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনকোয়ারী করে টপ ক্রিসেন্ট হিসাবে ফাইল এল। আমার চাচা সৈয়দ কামরুল আহসান বিরোধী দল করতেন। তিনি নাকি প্রচার করেছেন যে, সরকার এই বই ব্যান্ড করছে। গভর্ণর সাহেবের হয়তো ধারণা হয়েছিল যে এ গোপন কথা আমার মারফত পাচার হয়েছে। তাই সেদিন তিনি আমার সাথে ঐ রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন। ঘটনাটা আমি সঙ্গে সঙ্গে আখলাক হোসেন সাহেবকে বললাম। উনি তখনই ঐ মিটিং এর মধ্যে যেয়ে গভর্ণর সাহেবকে বললেন, 'ফাইল তো আমার কাছে। এ ব্যাপারে শামীম তো কিছুই জানে না।' পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

গভর্ণর সাহেব আমাকে এত বিশ্বাস করতেন যে, আমি লিখলে প্রেসিডেন্টের কাছে লেখা চিঠিও উনি না পড়ে দস্তখত করে দিতেন। কখনও উনি রাজনীতি নিয়ে কোন সরকারী কর্মচারীর সাথে আলাপ করতেন না। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদেরকে কোন সময়ই ব্যবহার করতেন না। রাজনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত জানতেই দিতেন না।

He was a good administrator. Administration-কে উনি পুরা grip এ রাখতেন। ডি.সি., এস.পি., এস.ডি.ও. এমনকি থানার ও.সি.-দের নাম পর্যন্ত উনি মনে রাখতেন।

He was a man of Principle. উনার Principle ছিল ঃ ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলিম লীগ। এর বাইরে তিনি কখনও যেতেন না। সেই Principle কে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।

গভর্ণর সাহেব সম্বন্ধে অনেকে অনেক মন্তব্য করেন। কিন্তু উনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের Loyal না থাকলে কাজ আদায় করতে পারতেন না। পূর্ব পাকিস্তানের এত উন্নতি উনি করাতে পারতেন না। এ কথাটা কেউ ভাবে না। আইয়ুব খান যদি জানেন যে গভর্ণর সাহেব পপুলার হবার চেষ্টা করছেন, তাহলে কাজ আদায় করা কঠিন হতে পারে। এ ধারণার ফলে উনি কখনও পপুলার হবার চেষ্টা করেননি। কাজ করতে হবে, কাজ করে গেছেন।

অনেক বাঙ্গালী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেউ 'ফাইট' দিতেন না। গভর্ণর সাহেব প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিশ্বাসী হবার সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সব ব্যাপারেই সাধ্যমত ফাইট দিতেন। সে সময় এটমিক এনার্জির চেয়ারম্যান ছিলেন ওসমানী সাহেব। গভর্ণর কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত ছিল যে, যদি ২টা সেন্টারের টাকা ম্যানেজ হয় তবে একটা হবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং অন্যটা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। আর যদি ১টা হয় তবে সেটা হবে পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু

www.pathagar.com

মোহিত সাহেব জানালেন যে, একটা হচ্ছে এবং সেটা পশ্চিম পাকিস্তানে। একথা শুনে গভর্ণর সাহেব জ্বলে উঠলেন। ওসমানী সাহেবের সাথে ঝগড়া লাগলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর কালাবাগের আমীর মোহাম্মদ খান উনাকে থামাতে চাইলে উনি রেগে মিটিং থেকে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

গভর্ণর সাহেব একান্ত চেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। সে সবের মধ্যে উল্লেখ করার মত ৮টি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজগুলি। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, থানা হেলথ সেন্টারগুলি, ইরি, 'বারি' প্রতিষ্ঠা আরো কত কি!

সুদীর্ঘ সময় ধরে কত অফিসে কাজ করেছি, এখনও করছি। কিন্তু গভর্ণর সাহেবের মত এত বেশী কাজ করার লোক দেখিনি। সব সময় এত বেশী ব্যস্ত থাকতেন যে খেতে খেতে ফাইলের বিবরণ শুনতেন এবং সই করতেন। উনার সাথে রাত্রি ২ টা ৩টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। আর এটা হঠাৎ দু'একদিন নয়, দিনের পর দিন এভাবে চলতো। ডান কানে কম শুনতেন, বাম কানে বেশী শুনতেন। সেজন্য আমাকে বামে বসতে হতো। ফাইলের ম্যাটার সব শুনে তবে সই করতেন। বেশী ব্যস্ত থাকার কারণে ফাইলওয়ার্কের সময় পেতেন না। জোর করে ঘরে ঢুকে ফাইল সামনে দিলে আবার ঘন্টার পর ঘন্টা ফাইল ওয়ার্ক চলতো। আমাদের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত কাজ না করে উপায় থাকতো না।

প্রত্যেক রাত্রে ৮ টা থেকে ১১ টার মধ্যে প্রত্যেক জেলার ডি.সি. কে ফোন করে জেলার পরিস্থিতি জানতে হবে এবং উনাকে রিপোর্ট দিতে হবে। রাত ১টা থেকে ২টার মধ্যে উনার হাতে রিপোর্ট দিতে হতো। কোন প্রব্লেম থাকলে উনি সাথে সাথে সেখানে ফোন করতেন। ডি.সি, এবং এস.পিদের ঘুম থেকে উঠে ফোন ধরতে হতো।

গভর্ণর সাহেব একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। ৩০ দিন রোজা রাখতেন এবং তারাবী নামাজ পড়তেন। রোজার মাসেই শুধু রাতে ছুটি পেতাম। তখন ফাইলওয়ার্ক হতো দিনে।

বাড়ীর ভিতর পর্দার ব্যবস্থা ছিল কড়াকড়ি। আমার বাড়ীর ভিতর যাবার অধিকার ছিল। এত বেশী রাতে শুলেও উনার ফজরের নামাজ কাযা হতো না কোনদিন। ইসলামী নিয়ম কানুনে কড়াকড়ি ছিল কিন্তু উনাকে গোঁড়ামী করতে দেখিনি কোন বিষয়ে। গভর্ণর হলেও সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন।

গভর্ণর সাহেবের ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়-স্বজনরা কোনদিন কোন অন্যায় সুযোগ সুবিধা নিতেন না। ছেলেরা তো তাঁকে বাঘের মত ভয় করতো। ছেলেদের কেউ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস করতো না। দীর্ঘ ৬ বছর আমি উনার সাথে ছিলাম। কিন্তু কোনদিন কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে দেখিনি।

www.pathagar.com

আলোকিত অতীত

www.pathagar.com

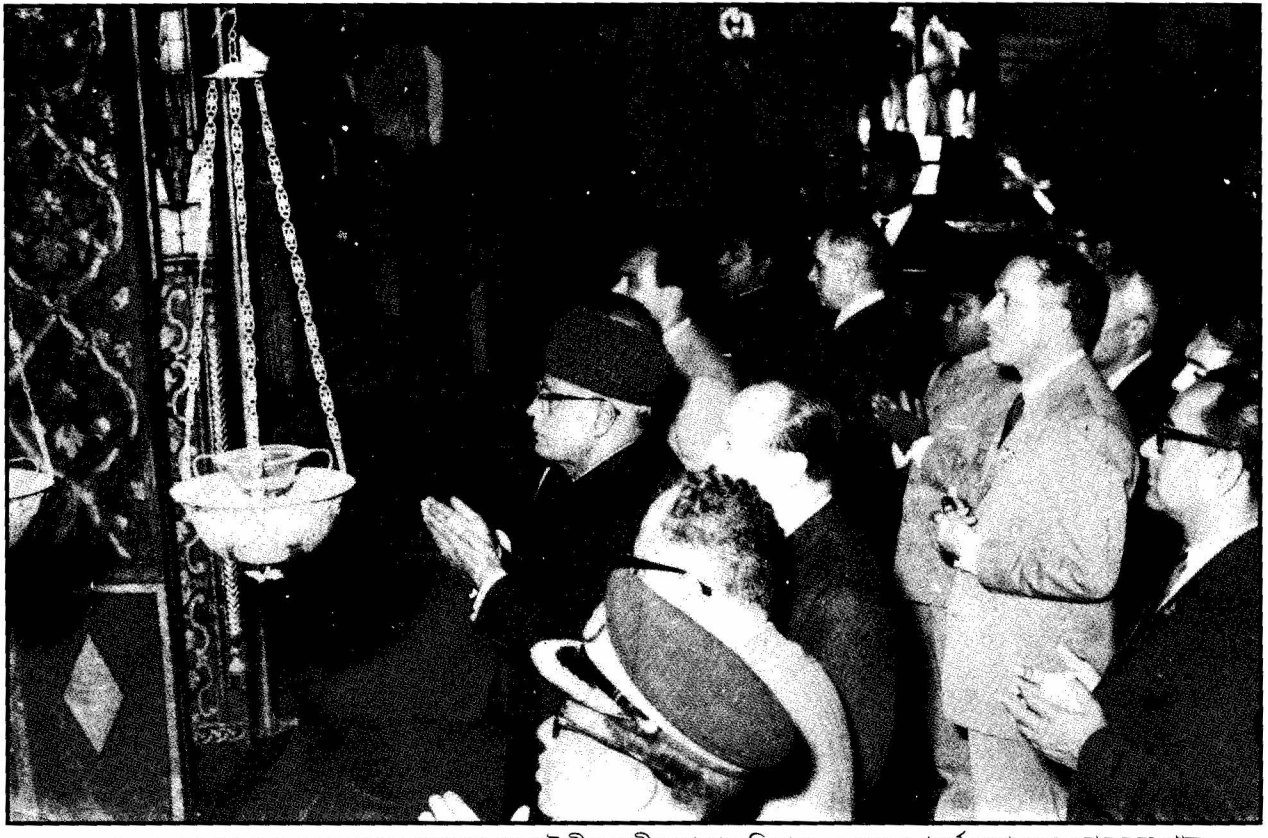

১৯৬৮'র মে মাসে তুরস্ক সফরকালে মাওলানা জালাউদ্দীন রুমীর মাজার জিয়ারত করছেন গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

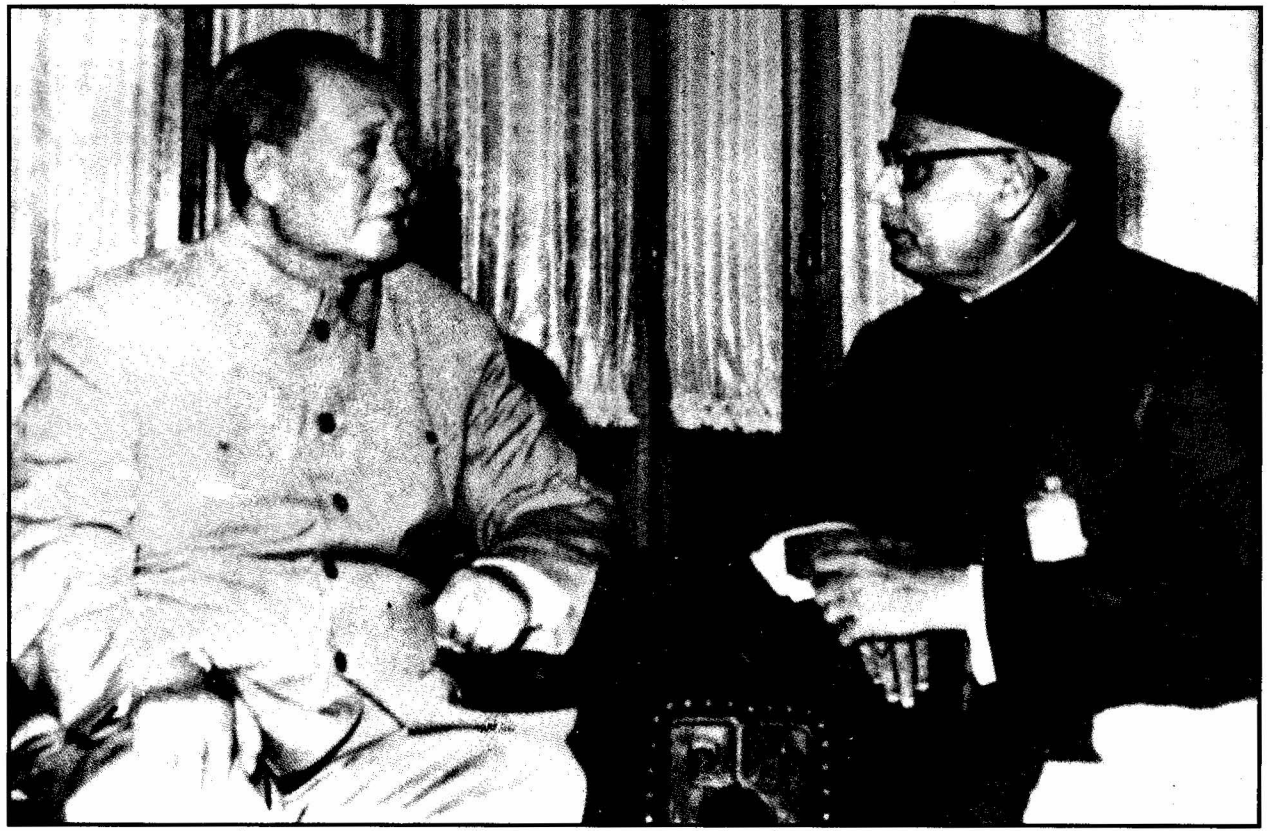

গণচীনের মহান নেতা মাওসেতুং এর সাথে আলাপরত গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

লন্ডন সফরকালে রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডেনবরার সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

মে ১৯৬৮ তুরস্ক সফরকালে কামাল আতাতুর্কের মাজার পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন গর্ভণর।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে কানাডার অটোয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য সরদার আমিরে আজম ও কমনওয়েলথ কনফারেন্সের

www.pathagar.com

মে' ১৯৬৮ মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের এর সাথে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

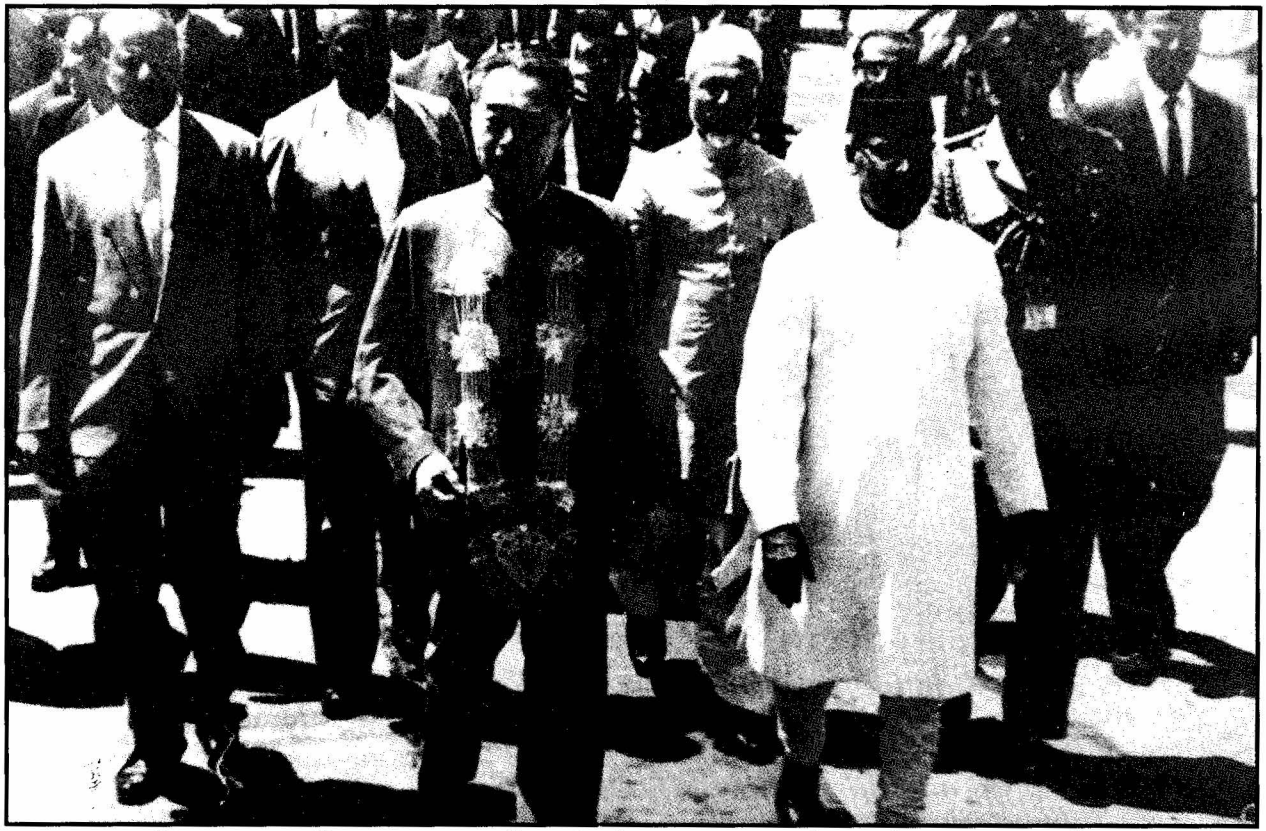

২৬ ফেব্রুয়ারি' ১৯৬৪ ঢাকা বিমান বন্দরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে বিদায় অভিনন্দনের প্রকালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই- এর সাথে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান। পার্শে অর্থমন্ত্রী ড: এম.এন হুদা ও শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত।

www.pathagar.com

২৫ মার্চ' ১৯৬৪; গভর্ণর হাউজে এক ভোজসভার প্রাক্কালে ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদুল সালাম আরিফের সাথে গর্ভণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

তুরস্কের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সোলেবীর সাথে গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খান।

www.pathagar.com

জর্ডানের তৎকালীন রাজা কিং হোসাইনের সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

ওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মাজার জিয়ারতের গভর্নর

www.pathagar.com

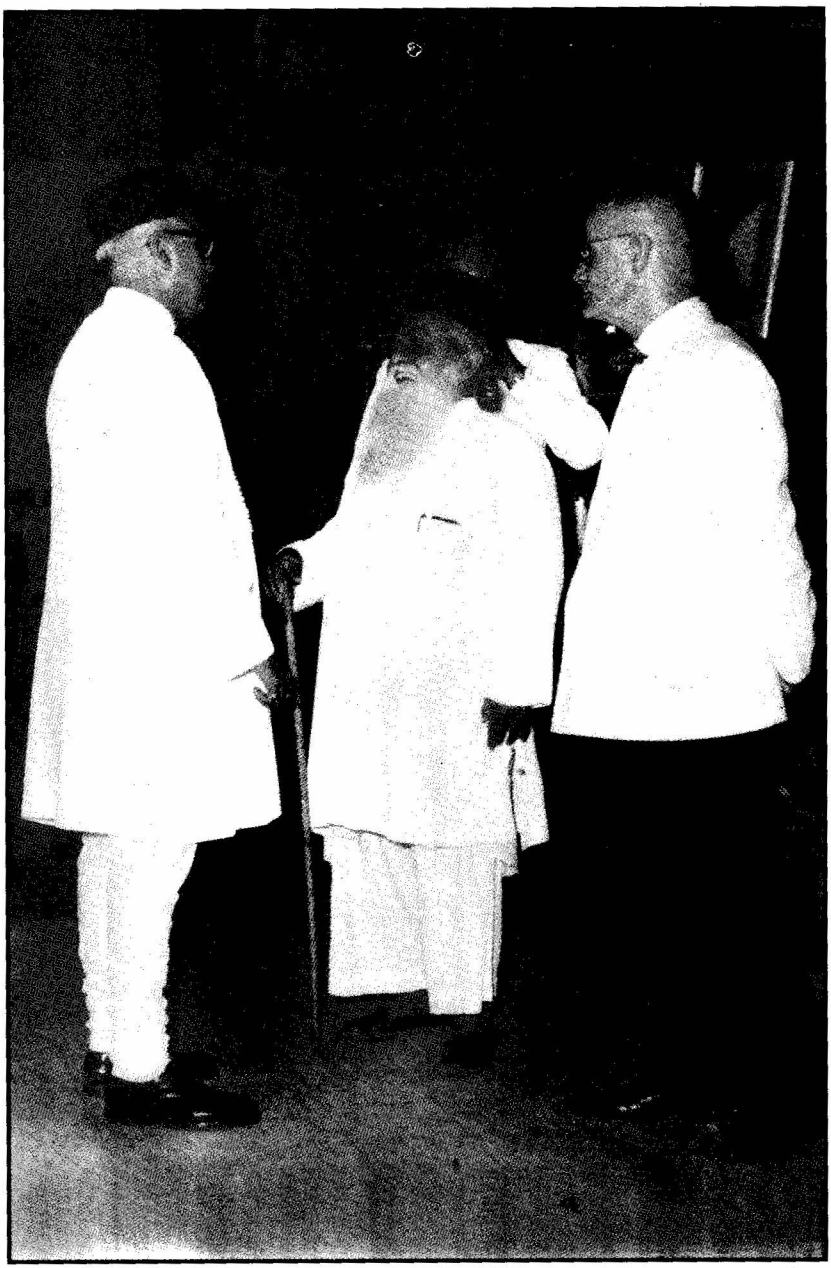

শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও জ্ঞান তাপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে আলাপরত গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

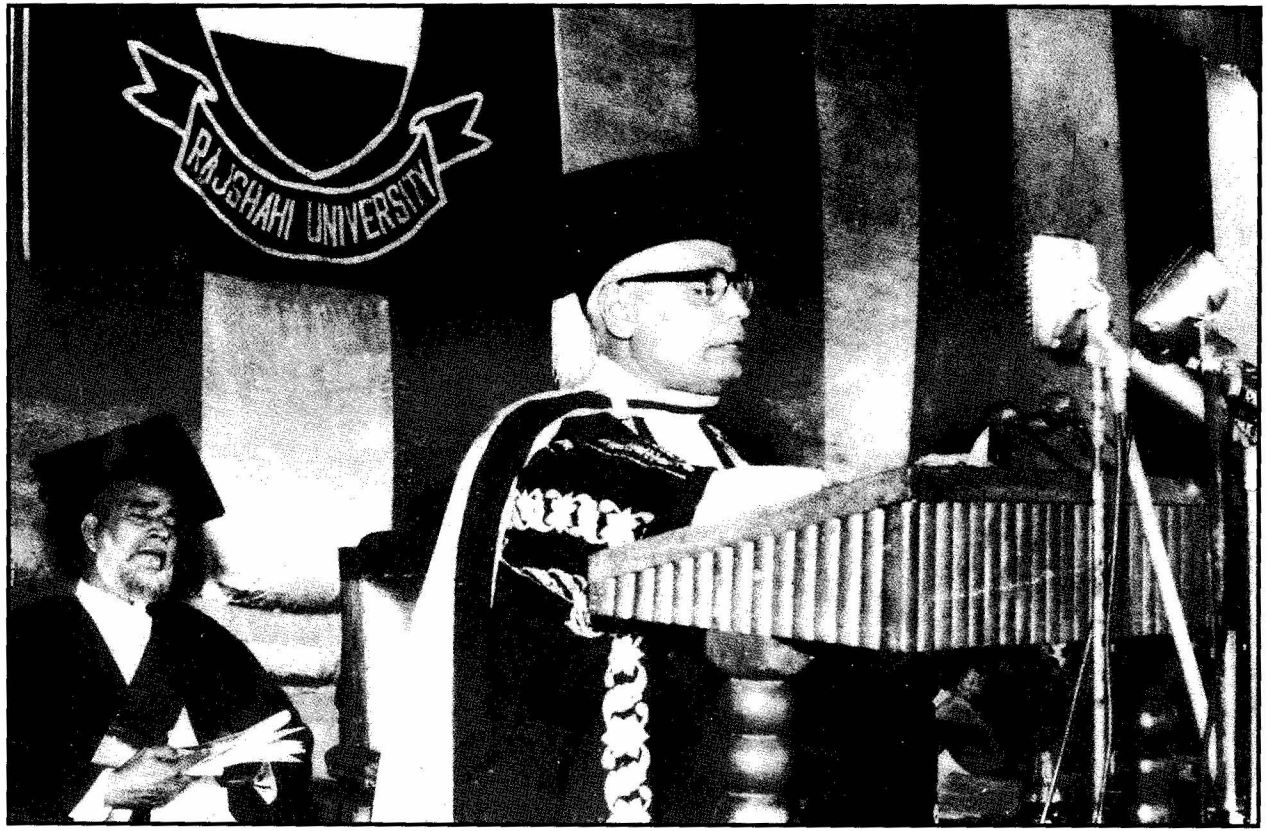

১৬ মার্চ' ১৯৬৮; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে বক্তব্য রাখছেন গভর্ণর আবদুল মোনয়েম খান।

www.pathagar.com

বিশেষ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, জাতীয় পরিষদের স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী ও গভর্ণর।

www.pathagar.com

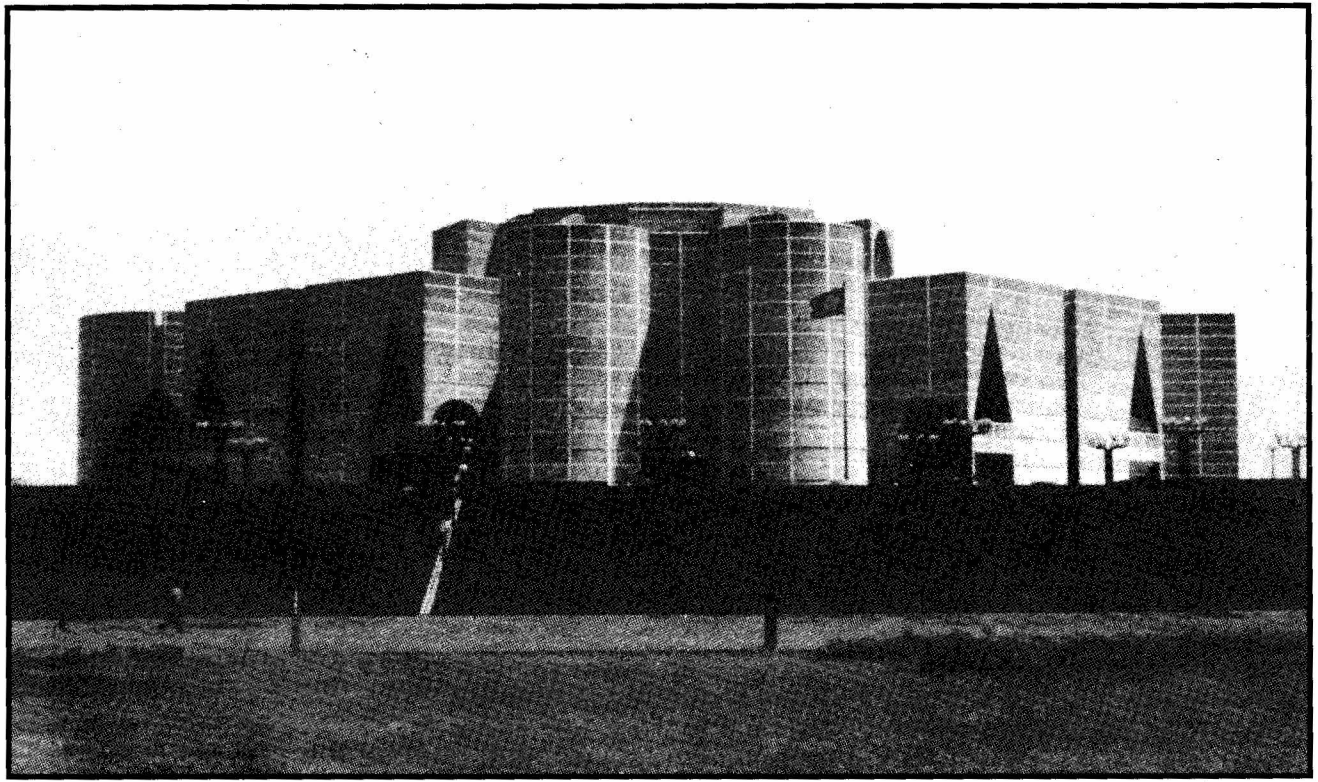

বি শ্বর অনন্য সাধারণ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন "জাতীয় সংসদ ভবন"। গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল জাতীয় সংসদ ভবন এবং সংলগ্ন এম.পি. হো স্ট লর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

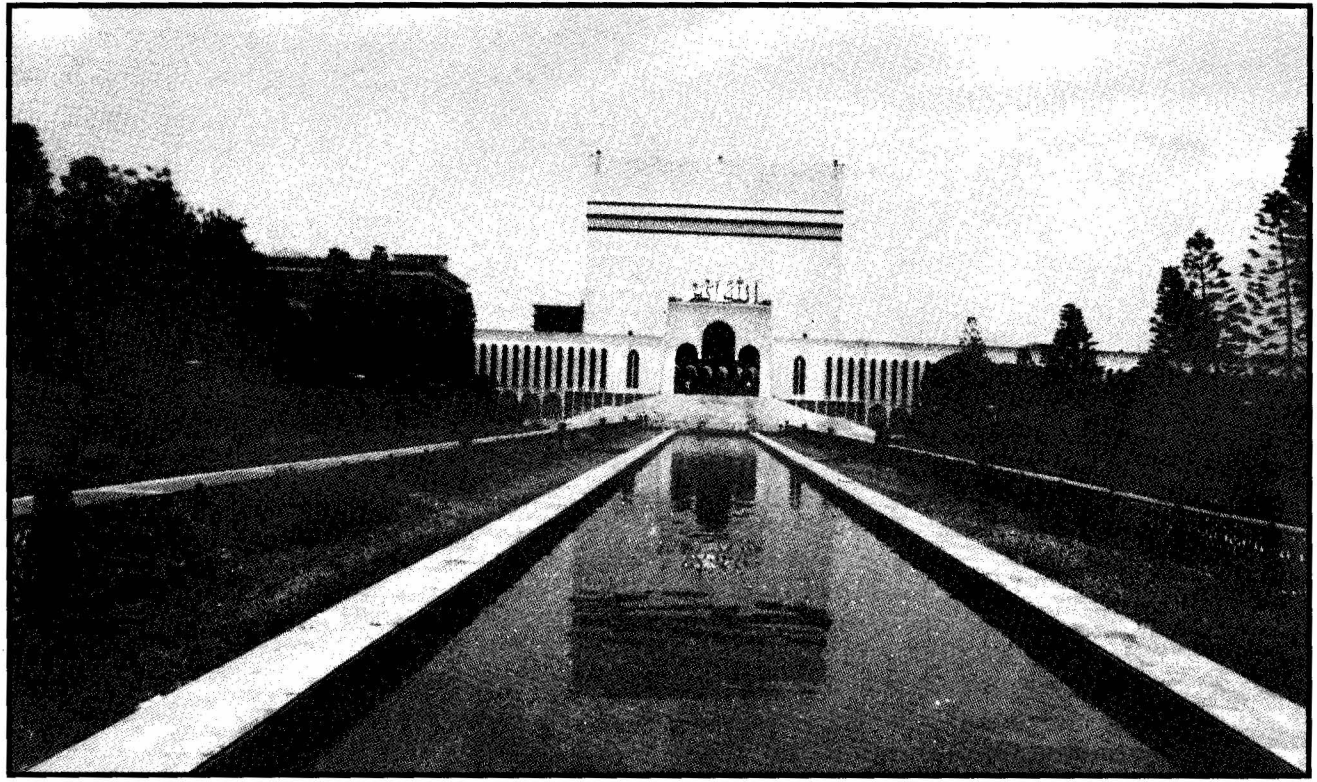

জাতীয় মসজিদ 'বায়তুল মোকাররম মসজিদ'। গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল মসজিদটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

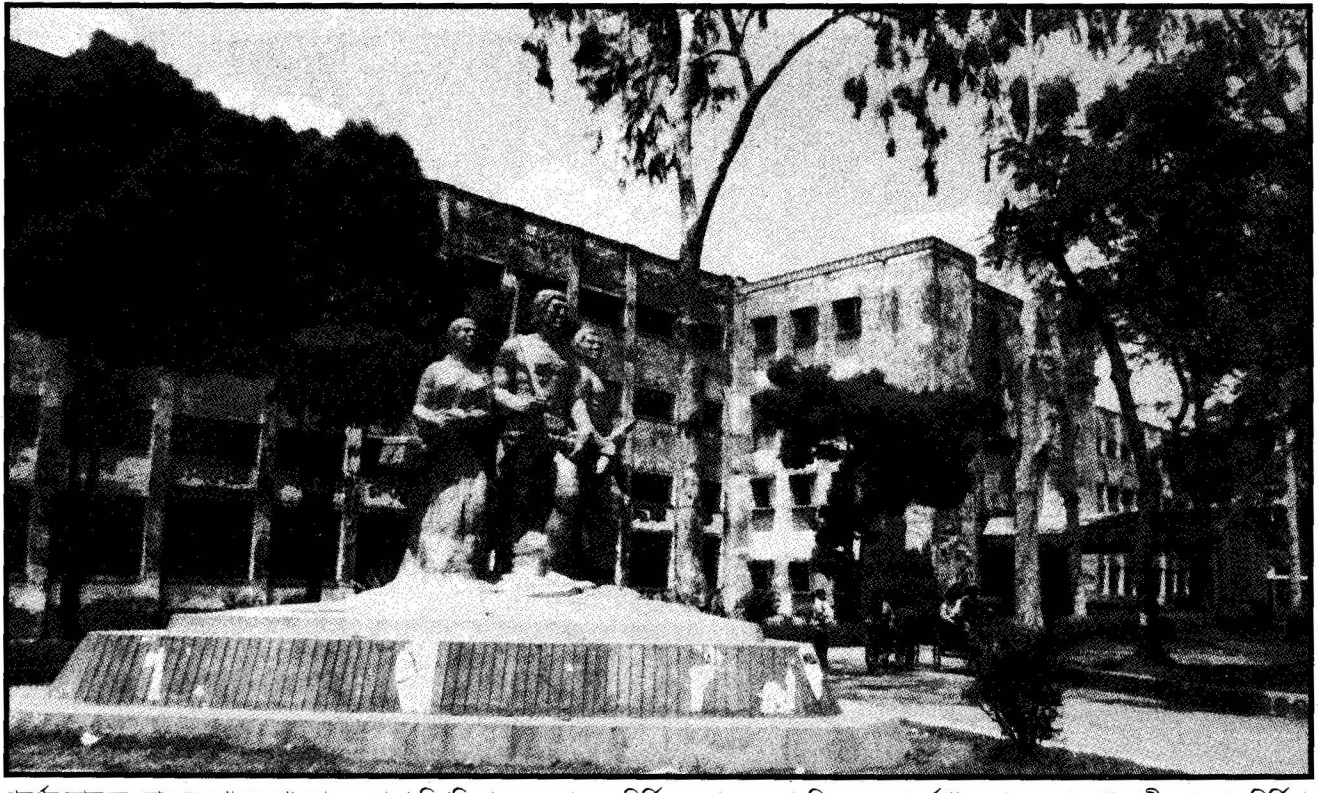

গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল য় কলাভবন নির্মিত ও চালু হয়। (মুক্তিযু দ্ধর ভাস্কর্য ''অপরা জয় বাংলা'' স্বাধীনতার পর নির্মিত)

www.pathagar.com

গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) এর দুটি রানও য় এবং টার্মিনাল ভব নব নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রেসি ডন্ট জিয়াউর রহমা নর শাসনাম ল বিমান বন্দরটি চালু করা হয়।

www.pathagar.com

কমলাপুর রেল ষ্টেশন। নির্মিত হয় গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল। ১৯৬৭ সা লর ১ মে তিনি রেল ষ্টেশনটি উ দ্বাধন ক রন।

www.pathagar.com

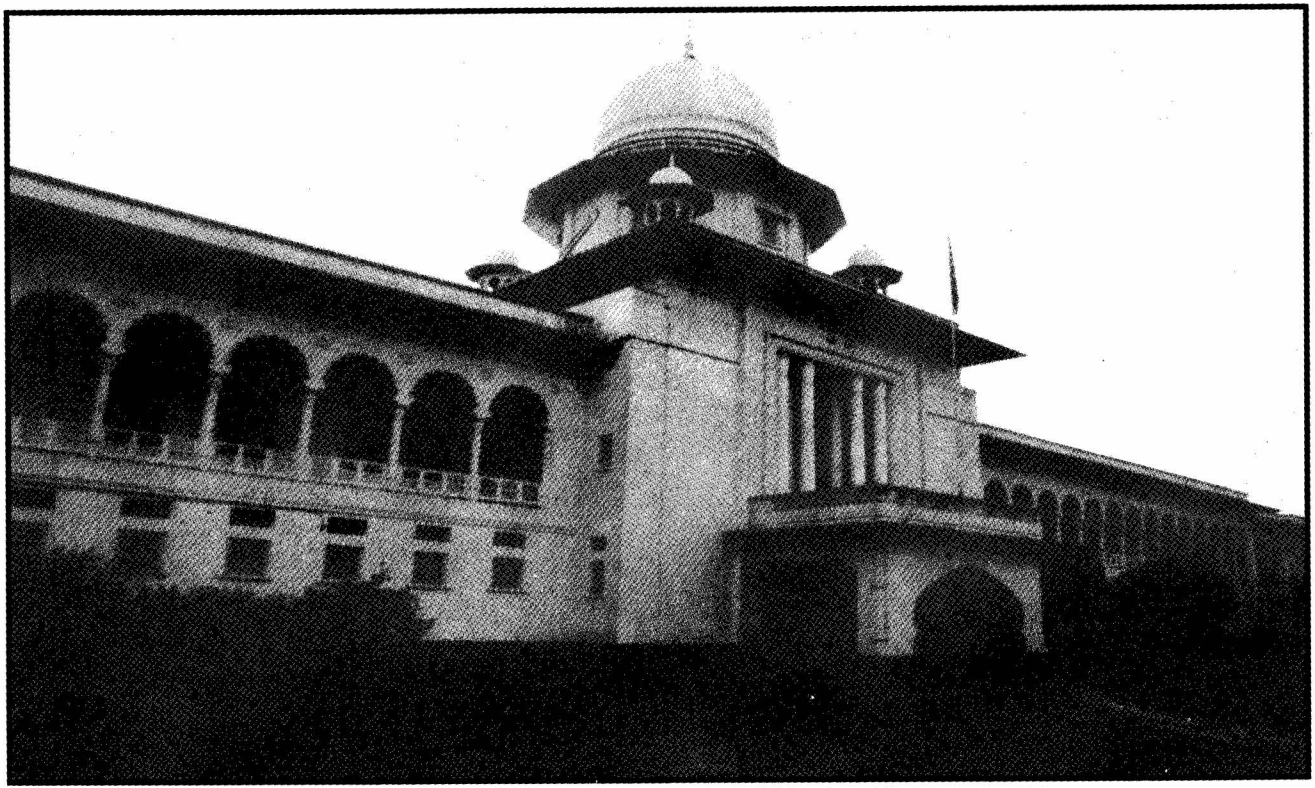

গভর্ণর আবদুল মোন য়ম খা নর শাসনাম ল নির্মিত হাই কার্ট ভবন।

www.pathagar.com

২৬ ফেব্রুয়ারি' ১৯৬৭; ঢাকা বিমান বন্দরে নেপালের তৎকালীন রাজা মহেন্দ্র ও রানীকে অভর্থনা জ্ঞাপন করছেন গভর্ণর আবদল মোনায়েম খান।

www.pathagar.com

আলোকিত অতীত

একটি স্মারক সংকলন